My Memory and Friendship with Pal-san

- Yukio Takeyari

I met Mr. BN Pal (I call him Pal san in Japanese way) in Bangalore about 10 years back and became a very good friend since then.

In 2008, I was transferred to Bangalore as Managing Director of Sony India Software Centre. At that time, Pal san was a senior executive management of Indian IT company and responsible for Sony project. It was the beginning of our relationship. He was very much respected and appreciated by Sony team because he knows how to work with Japanese and Japanese company from his past experience to work in Japan as Managing Director of Motorola Software.

Apart from business relationship, I and Pal san was actively supporting IJCCI (Indo Japanese Chamber of Commerce and Industry-Karnataka) activities to promote India-Japan partnership. We participated various events together.

Later, Pal-san started his own company, so called "Technology Startup" at the incubation center of IIIT Bangalore. I was invited to visit there and discussed about his idea. He was very much excited about his business.

At the end of 2015 after staying in Bangalore for 7 years, I came back to Japan and retired from Sony. But, our relationship continued.

In 2016, Pal san's company was selected by Japanese government and invited to Japan for the presentation at CEATEC 2016 event. He asked me to support his presentation, so that Japanese audience can understand easier. We exchanged various ideas by Skype and e-mail. Actually, he did a very good presentation. During his stay in Japan, Pal san invited me to Druga Puja Festival which was held in Tokyo. I joined, and I enjoyed a lot because I remember various exciting festival I participated in India.

Even after coming back to Japan, I'm visiting Bangalore a few times a year.

I always meet him with prior appointment or without any appointment. In October last year, I visited Bangalore to participate some IT event. I could not inform Pal san about my visit in advance. But, I met him at the event really by chance. When he found me, he was very friendly and cheerful as usual. It was my last interaction with him.

I'm very shocked and very sorry to know Pal san passed away quite suddenly. I believe that my memory and friendship with Pal san will be forever. I pray that his soul may rest in peace. My condolences go to the whole family.

Pal san, thank you so much.

At Tokyo Durga Puja

20130920 IJCCI Seminar with Pal-san

20160512 with Pal-san and Gupta-san

প্রতিমা দর্শন আনন্দমঠে

- মানিকচন্দ্র ঘোষ

ভারতীয় সংকৃতিতে মাতৃরূপের শক্তি আরাধনা চলে আসছে সেই বৈদিক যুগ থেকে । আমাদের তথা ভারতীয় অনুভূতিতে সেই মহাজাগতিক মাতৃশক্তির প্রকাশ ঘটেছে নানা ভাবে; কখনো তিনি ধরা দিয়েছেন মা কালী-চণ্ডী রূপে, কখনো বা তিনি জগদ্ধাত্রী, কখনো বা তিনি শিব সোহাগী পার্বতী বা দশভুজা মা দুর্গা রূপে । বৈদিক সাহিত্যে, পুরাণে, চণ্ডীমঙ্গলে, অন্নদামঙ্গলে ও আমাদের দৈনন্দিন আচার-অনুষ্ঠানে ভরে রয়েছে তাঁর প্রশস্তি ও জয়গান । সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভারতীয় সনাতনী চিন্তার ভিত্তি স্তম্ভে দাঁড়িয়ে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে, সেই জগদ্ধাত্রী, কালী, ও দশভুজা দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার মূর্ত্তি স্থাপনা করেছেন তাঁর আনন্দমঠে । তবে তা নিছক প্রতিকৃতি নয়; তিনি দেখেছেন আর দেখিয়েছেন এই তিন মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে তাঁর স্বদেশকে, স্বদেশেভূমির ইতিহাস, সেদিনের পরাধীন মাতৃভূমির অরাজকতা, অসহনীয় দুর্ভিক্ষ ও শোষণের বর্বরতা । তিনি দেখিয়েছেন আশার আলোয় দীপ্ত ভবিষ্যৎ স্বাধীন মাতৃভূমির ছবি । তাঁর মাতৃসাধনা তাঁকে শিখিয়েছে মা ও মাতৃভূমি সমতুল । জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী । মা জগদ্ধাত্রী, মা কালী, ও মা দুর্গা, সেই শাশ্বত মাতৃসত্তার প্রতিবিম্ব । তাই শারদ উৎসবে আনন্দমঠের ভাবনা মনকে টানে, আলোড়ন জাগায় । আমাদের টোকিও বেঙ্গলির শারদীয় উৎসবে দশ প্রহরণ ধারিণী অজয়া শক্তি বলপ্রদায়িনী মা দুর্গা প্রতিমা দর্শনের ভিতর দিয়ে স্মরণ করি বঙ্কিম সৃষ্ট আনন্দমঠের দেবী বন্দনা । পাশাপাশি দেখে নি আনন্দমঠের প্রতিমাকে একান্ত আপন ভাবে স্বদেশভূমির পবিত্রতা নিয়ে আনন্দমঠের চরিত্র মহেন্দ্রের চোখে ও মঠের ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ ঠাকুরের বর্ণনায় ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ ' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গ দর্শনে' বাংলা ১২৮৭-৮৯ সালে [ইংরেজি ১৮৮০-৮২], পরাধীন ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলার ১১৭৬ সালের [ইংরেজি ১৭৬৯] ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে । উপন্যাসের মহেন্দ্র সেই দুর্ভিক্ষ জর্জরিত সাধারণ মানুষদের প্রতীক । আনন্দমঠে সেই মহেন্দ্রকে ব্রহ্মচারি এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বিষ্ণু মূর্তির কোলে এক মোহিনী মূর্তি দেখিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর সন্তান বলে । অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভক্তি বিজড়িত গলায় শ্রদ্ধা ভরে মহেন্দ্রকে বলেছেন বল, "বন্দে মাতরম" । তারপর মহেন্দ্রকে দেখিয়েছিলেন পরপর মায়ের তিন মুর্তি ।

প্রথমে মহেন্দ্রকে দেখিয়েছিলেন এক অপূর্ব সুন্দর সর্বাভরণভূষিতা সর্ব অলঙ্কারা হাস্যময়ী জগদ্ধাত্রী মূর্তি যিনি বন্য পশুদের পদতলে দলিত করে পদ্মাসনাধিষ্ঠা, যাঁর গায়ের রঙ বালার্কবর্ণাভা । ব্রহ্মচারী স্বদেশভূমির সেই জগদ্ধাত্রী মূর্তি দেখিয়ে বলেছেন - " মা যা ছিলেন । " তিনি জগদ্ধাত্রী মূর্তি দেখিয়ে মূলতঃ স্বদেশের অতীত সমৃদ্ধ ইতিহাসের প্রতি মহেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন । যখন বিশ্বে সভ্যতার আলো সবর্ত্র পৌঁছায়নি, মাতৃভূমি ভারতবর্ষ তখন ছিল এক উন্নত, ধন ও সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ । তাই মা জগদ্ধাত্রী ঐশ্বর্যশালিনী । মায়ের বালার্কবর্ণাভা গায়ের রঙ বস্তুতঃপক্ষে আদিমতার পর্দা ঠেলে সভ্যতার নতুন ভোরের অরুনাভ আলোয় সেদিনের উদ্ভাসিত ভারতভূমির প্রতীক ।

মহেন্দ্র জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করার পর ব্রহ্মচারী তাঁকে এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে মাটির নীচে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে গেলেন মায়ের দ্বিতীয় মুর্ত্তি দেখানোর জন্যে । উদ্দেশ্য মহেন্দ্রের সামনে তুলে ধরা সেই ঐশ্বর্যশালিনী মায়ের বর্তমান করুণ অবস্থা যার মূলে রয়েছে অমানবিক শোষণ ও দীর্ঘ পরাধীনতার জ্বালা । ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে দেখালেন মায়ের কালী মূর্তি- পরাধীন মাতৃভূমির অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী হৃতসর্বস্বা, নগ্নিকা রূপ । তিনি মহেন্দ্রকে বললেন-" দেখ, মা যা হইয়াছেন । " তিনি আরও জানালেন এ পরাধীন দেশে সর্বত্রই শ্মশান, তাই মা কঙ্কালমালিনী । যিনি শিব, সুন্দর তিনিই পরে রয়েছেন মায়ের পদতলে । দেশমায়ের এ করুণ অবস্থার কথা বলতে গিয়ে আবেগে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন সেদিন সংযত ও দৃঢ় মনের মানুষ ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ মহেন্দ্রের সামনে ।

মাকালী দর্শন ও প্রণাম শেষে মহেন্দ্রকে মায়ের তৃতীয় মূর্ত্তি দেখাতে নিয়ে গেলেন ব্রহ্মচারী অন্য পথে । এ পথ অন্ধকার থেকে আলোয় আসার পথ; এ পথ মিলেছে মর্মরপ্রস্তর দিয়ে তৈরি প্রশস্ত দশভুজা মা দুর্গার মন্দিরের । এখানে পাখিরা মধুর গলায় গান গায়. মা দুর্গার সোনার মূর্ত্তি প্রভাতের আলোয় হয়ে ওঠে জ্যোতির্ময়ী । ব্রহ্মচারী দুর্গা মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে মহেন্দ্রকে জানালেন -,"এই মা যা হইবেন । দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত দিগভুজা" পরে নিজের আবেগ সংযত করে নিয়ে আরো বললেন ,"দিগ্‌ভুজা নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দিনী-বীরেন্দ্র -পৃষ্ঠবিহারিণী – দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী-বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী-সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ; এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি । "

বস্তুতঃ পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীন মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে দেখতে চেয়েছেন স্বয়ংসম্পূর্ণা দশভুজা মা দুর্গা মূর্ত্তিতে । সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করে দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে চাই ধন, ঐশ্বর্য, চাই লক্ষ্মী; চাই বিদ্যা, চাই সরস্বতী; চাই বলরূপী কার্তিকের মতো যোদ্ধা ও কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ । তাই আনন্দমঠে দশভূজা দুর্গতি নাশিনী মা দুর্গার অধিষ্ঠান মা জগদ্ধাত্রী ও মা কালীর পাশাপাশি ।

আনন্দমঠের মাতৃ সাধনা বস্তুতঃ পক্ষে অনবদ্য, প্রাসঙ্গিক ও হৃদয়স্পর্শী । প্রতিমা দর্শন আনন্দমঠে সহজেই মনে করিয়ে দেয় মাতৃসমা জন্মভূমির প্রতি আমাদের দায়িত্বের কথা । তুলে ধরে আমাদের সামনে জাতীয়তাবোধের নতুন পাঠ; আজও শেখায় আজকের স্বাধীন স্বদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণা দশভুজা মা দুর্গা মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্র । আনন্দমঠে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের শিখিয়েছেন আমাদের কি করা উচিত । মহেন্দ্র মা দুর্গা মূর্ত্তি দর্শন করার পর ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "মার মূর্তি কবে দেখিতে পাইব?"

উত্তরে ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ জানিয়েছেন ,"যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন । "

বঙ্কিম চন্দ্র আনন্দমঠের উপক্রমণিকায় ব্রহ্মচারীর সেই কথার প্রায়ই প্রতিধ্বনি করেছেন ; দ্বার্থহীন ভাষায় দায়িত্ব নিয়ে দেশের জন্যে আমাদের কি করা দরকার তা জানাতে গিয়ে বলেছেন চাই স্বদেশের প্রতি ভক্তি । ভক্তিই বড় ।

" কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধ মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

এইরূপ তিন বার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল । তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?"

প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্বস্ব । "

প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে । "

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল, "ভক্তি । "

তাই আজকের এ শারদীয়া অনুষ্ঠানে মা দূর্গার আরাধনার ভিতর দিয়ে মাতৃভূমি স্বদেশকে স্মরণ করি । আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে পঞ্চ প্রদীপ জ্বালিয়ে ভক্তির নৈবেদ্য সাজাই । বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলি, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী । বন্দে মাতরম" । আর প্রণাম জানাই সেই বৈদিক মন্ত্রে-

"সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ-সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে" ।।

রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল ও ইন্দিরা - প্রজন্ম পরম্পরা

- শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধী তিন প্রজন্মের তিন জন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব । কর্মজীবনের বিস্ময়কর বহুমুখীতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মানুষ আর জওহরলাল ও তাঁর কন্যা ইন্দিরা প্রধানত রাজনীতির জগতের । তাই তাঁদের কর্মজীবন এবং ভারতের জাতীয় জীবনে অবদানের ক্ষেত্র এক নয়, কিন্তু যেন একটি অদৃশ্য সূত্রে তাঁরা ছিলেন গভীরভাবে গ্রথিত । গত বছর, ২০১৭ সালে, ইন্দিরার জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হয় । এই তিন জন ভারতীয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কয়েকটি দিক আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ।

'বাঙ্গালী কবি' হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচিতি এবং তাঁর কর্মজীবন প্রধানত বাংলা ভূখন্ডে । তাই বাংলা ভাষাভাষী মানুষ তাঁর সাহিত্য ও বহুবিধ অন্যান্য কাজকর্মের দ্বারা সর্বাগ্রে এবং সবচেয়ে বেশী মাত্রায় প্রভাবিত হবে এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'আত্মিক' (spiritual) অবস্থিতি ভারতবর্ষে, যেটি তাঁর অনুভূতিতে শুধু একটি ভৌগলিক সীমানায় চিহ্নিত ভূখন্ড নয়, একটি উদার ও উন্নত সভ্যতার লীলাভূমি, বহু মানুষের বাসস্থান ও আশ্রয়স্থল - 'মহামানবের সাগরতীর' । তাই ভারতের মানুষ যাদের ভাষা বাংলা নয় বা যাদের সংস্কৃতি-বোধও অ-বাঙ্গালী, তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি শুধু কি একজন বাঙ্গালী কবি হিসেবে বা খ্যাতিমান ভারতীয়দের মধ্যে একজন হিসেবে, না জাতীয় জীবনে কবির বহুবিধ অবদানের মাধ্যমে তাদেরও 'নিজের মানুষ' হিসেবে? এই বিষয়টি এই প্রবন্ধের অন্যতম জিজ্ঞাসা । জওহরলাল এবং ইন্দিরা বাংলার বাইরের ভারতীয় এবং রবীন্দ্র-ঘনিষ্ঠ । পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে কবির সঙ্গে তাঁদের যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধার । তাই দুই প্রজন্মের এই দু'জন (অবাঙ্গালী) ভারতীয় তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং বৃহত্তর ভারতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কি ভাবে অনুভব এবং মূল্যায়ন করেছিলেন তার অনুসন্ধান এই প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরে করার চেষ্টা করা হয়েছে ।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামের মাধ্যমে তার জাতীয় চরিত্র ও পরিচিতিকেও নতুনভাবে আবিস্কার করায় সচেষ্ট হয়েছিল, হয়ত খানিকটা সচেতনতা ছাড়াই । এই অনুসন্ধান যে 'নতুন ভারতের' পথ নির্দেশ করেছিল তার দিশারিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল অনন্য । "নতুন ভারতের স্রষ্টা" বলতে যে সব মানুষের নাম উঠে আসে, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই অগ্রগণ্য । তাই তাঁর সর্বভারতীয় পরিচয় "গুরুদেব" হিসেবে - তিনি জাতির শিক্ষক । মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে এই প্রবন্ধের নির্বাচিত তিন চরিত্রের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ আরও একজন বিখ্যাত (অবাঙ্গালী) ভারতীয়ের সঙ্গে কবির বিশেষ সম্পর্কের কথা সংক্ষেপে বলে নেওয়া হয়ত প্রসঙ্গ-বহির্ভূত হবে না । এই মানুষটি হলেন মহাত্মা গান্ধী । বিশ শতকের বিশ-তিরিশের দশকে ভারতের জাতীয় জীবনের মহানায়ক ছিলেন এই দুই নেতা – যাঁরা গুরুদেব ও মহাত্মা বলে আখ্যায়িত ।

গুরুদেব ও মহাত্মা

বিলেত-ফেরত, প্রতিষ্ঠিত, ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সক্রিয় রাজনীতিতে এসেছিলেন অপরিকল্পিতভাবে, ঘটনাচক্রে বলা যায় । উকিল হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে তিনি ব্যক্তিগত লাঞ্ছনা ও কঠোর বর্ণবিদ্বেষ প্রত্যক্ষ করেন । তার প্রতিবাদে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন তাঁর নেতৃত্বে কিছুটা সুফলও আদায় করতে সক্ষম হয় । তিনি সপরিবারে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করতে শুরু করেন ডারবানের কাছে ফিনিক্সে । উদ্ধত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে তিনটি 'অস্ত্র' তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন সেগুলি ছিল অহিংসা, সত্যাগ্রহ ও সঙ্ঘবদ্ধ অত্যাচারিতার সঙ্গে অসহযোগ । এগুলির বিবর্তন ও প্রয়োগ এই সময়েই শুরু হয়েছিল । এই সুবাদেই তাঁর সুনাম ভারতীয়দের কাছে বা বিশ্বের অন্যত্র পৌঁছয় তাঁর নিজের ভারতীয় রাজনীতিতে আসার আগেই । দীর্ঘ একুশ বছর দেশের বাইরে কাটিয়ে গান্ধীজি পাকাপাকি ভাবে দেশে ফিরে আসেন ১৯১৪ সালে । রবীন্দ্রনাথ তখন শুধু বাঙ্গালী কবিই ন'ন, তিনি এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী । তাঁর পরিচিতি সর্বভারতীয়, তাঁর খ্যাতি বিশ্বজোড়া ।

যদিও এই দুই ভারতীয়ই ছিলেন স্বনামধন্য, তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় বা সাক্ষাতকার তখনও হয় নি । কিন্তু গান্ধীজির দক্ষিণ আফ্রিকার কাজকর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধার থেকেই নিশ্চয়ই ফিনিক্স আশ্রমের সদস্যদের মধ্যে যাঁরা গান্ধীজির সঙ্গে বা কিছু আগে ভারতে ফিরে আসেন তাঁদের শান্তিনিকেতনে প্রাথমিকভাবে আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমে । এঁদের দুজনেরই বন্ধু ইংরেজ চার্লি (দীনবন্ধু) এ্যান্ড্রুজ এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং তাঁর আমন্ত্রণে গান্ধীজি, সস্ত্রীক, প্রথমবারের মত শান্তিনিকেতনে যান ১৯১৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী, রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতেই । তাঁর পরিকল্পনা ছিল শান্তিনিকেতনে কিছুদিন কাটাবেন চার্লি এ্যান্ড্রুজ ও কবির আর এক আশ্রমবাসী ইংরেজ বন্ধু উইলিয়াম পিয়ারসনের আতিথ্যে, আশ্রমের ব্যবস্থাদির সঙ্গে পরিচিত হতে । কিন্তু ১৯শে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজির রাজনৈতিক অভিভাবকতুল্য নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলের হঠাৎ মৃত্যু হয় পুণাতে এবং গান্ধীজিকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে ফিরে যেতে হয় । আশ্রম-পরিচিতি পূর্ণতর করার জন্যই বোধহয় তিনি শান্তিনিকেতনে আবার ফিরে আসেন ৬ই মার্চ এবং থাকেন ১১ তারিখ পর্য্যন্ত । কবিও ইতিমধ্যে তাঁর আশ্রমে ফিরেছেন, তাই তাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় এই প্রথম হল । এই দুই 'দূরের বন্ধুর' পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলতে নিশ্চয়ই সাহায্য করেছিল আশ্রমের সহজ-সরল ঘরোয়া পরিবেশ । নানা বিষয়ে তাঁদের আলোচনা করার সুযোগ হ'ল কখনও একান্তে, কখনও বা এ্যান্ড্রুজ এবং পিয়ারসন সাহেবদের উপস্থিতিতে । এর পর থেকে সাক্ষাৎকার, পত্রালাপ বা লেখালেখির মাধ্যমে তাদের নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিবিড়তর হয়েছিল বলা যায় । দেশের, সমাজের বা বিশ্বসভ্যতার বিভিন্ন সমস্যা ও তাদের সমাধানের উপায় নিয়ে তাঁদের মতের মিল যেমন ছিল, তেমনি ছিল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের গভীর মতানৈক্য । যুক্তি-ভিত্তিক বা আদর্শগত মত-পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্ব যে বজায় রাখা যায় কবি ও মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্ক তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । গান্ধীজি কবির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন - "I started with a disposition to detect a conflict between Gurudev and myself but ended with the glorious discovery that there was none" । রবীন্দ্রনাথও বিভিন্ন সময়ে বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজির চিন্তা-ভাবনা, মতামত, নেতৃত্ব বা ব্যক্তিত্ব নিয়ে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন যেগুলো অনেক সময়ে তাঁদের আদর্শগত গভীর গরমিলের সাক্ষ্য বহন করে । কিন্তু তিনি বিক্ষিপ্ত ঘটনাদির ঊর্ধ্বে যে মানুষটিকে চিনেছিলেন তাঁর পরিচিতি এই ভাবে দিয়েছিলেন - "যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু সৎ, মহাত্মাজি তাহারই প্রতীক । তিনি ভারতের প্রাণস্বরূপ" । গান্ধীজিও কবিকে চিনেছিলেন স্বদেশের "মহান প্রহরী" (Great Sentinel) হিসেবে, যিনি দেশের সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে কুসংস্কার ও ক্ষুদ্র-মনস্কতার ঊর্ধে রাখার জন্য আজীবন সচেষ্ট ছিলেন ।

কবির জীবদ্দশায় গান্ধীজি শেষবারের মত শান্তিনিকেতনে আসেন, সস্ত্রীক, ১৯৪০ সালে, অসুস্থ কবিকে দেখতে । প্রিয় বন্ধুকে বিদায় দেবার সময় কবি একটি অনুরোধ করেন লিখিতভাবে, মর্মস্পর্শী ভাষায় । তাঁর মৃত্যুর পর কবি তাঁর "জীবনের উৎকৃষ্ট সৃষ্টিসম্পদের বাহক" (a vessel which carries the cargo of my life's best treasures) শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যত রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থায়ীত্বের দায়িত্ব গান্ধীজি স্বয়ং যেন নেন, এই ছিল কবির অনুরোধ । গান্ধীজি দেশের সমস্ত মানুষের অবগতির জন্য ব্যপারটি প্রকাশ্যে আনেন এবং তাঁর নিজের মত জানান এই ভাষায় - "who am I to take this institution under my protection? It carries God's protection because it is the creation of an earnest soul" । এরপর ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও সময় করে তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন অন্যান্য কাজের মধ্যে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করতে । এইটিই ছিল

শান্তিনিকেতনে তাঁর শেষবারের মত আসা । কবির অনুপস্থিতি তাঁর মনকে নিশ্চয়ই নাড়া দিয়েছিল । আশ্রমবাসীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি প্রয়াত বন্ধুকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন এই বলে - "it is my conviction ... that Gurudev as a person was much bigger

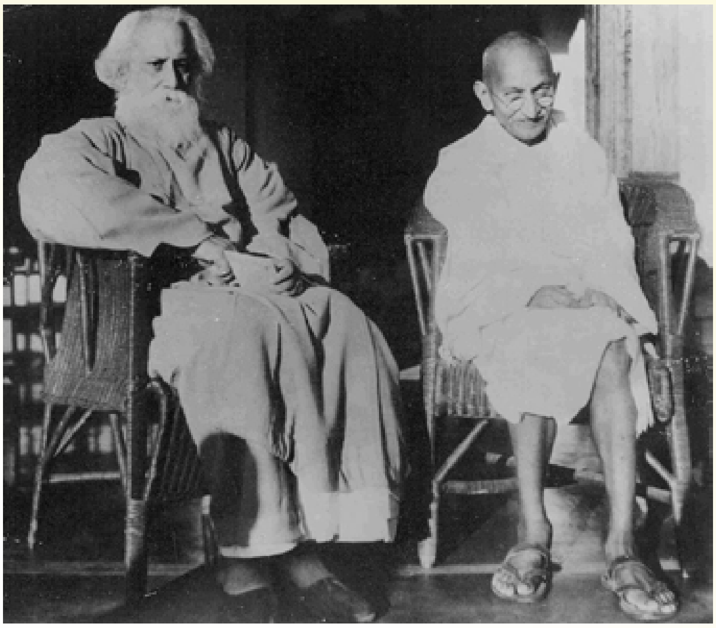

than his works; bigger than even this institution" ।

গুরুদেব এবং মহাত্মা

উপযুক্ত উত্তরসূরী জওহরলাল - গুরু-শিষ্য পরম্পরা

এলাহাবাদের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল মোতিলাল নেহরুর পুত্র জওহরলালের জন্ম ১৮৮৯ সালে । তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তাঁর পিতার ও কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মের বছর, মাস ও দিন একই । তাই তাঁর সঙ্গে কবির সম্পর্ক যে পুত্র ও পিতার মত ছিল এ কথা একাধিক অর্থেই বলা যায় । বিলেতের অভিজাত পরিবারের পুত্রদের জন্য শীর্ষস্থানীয় স্কুলগুলির অন্যতম হল লন্ডনে অবস্থিত হ্যারো স্কুল । জওহরলাল ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৮ পর্য্যন্ত এই স্কুলে পড়েন । স্কুলের শিক্ষা শেষ করে তিনি আরও একটি অভিজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে পড়শোনা করেন । কেম্ব্রিজ থেকে ডিগ্রী সম্পূর্ণ করে জওহরলাল লন্ডনের আইন শিক্ষার কলেজ ইনার টেম্পলে ব্যারিস্টারি পড়েন এবং দেশে ফেরেন উচ্চ স্তরের 'বিলেত-ফেরত' উকিল হিসেবে ১৯১২ সালে । পিতা মোতিলাল পেশায় উকিল হলেও দেশের রাজনীতিতেও ছিলেন সক্রিয় । তাঁর প্রভাব এবং স্বদেশ সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তা বা অভিজ্ঞতা উকিল জওহরলালকেও প্রথমে রাজনীতি জগতের কর্মী ও অচিরেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করে । রাজনীতির জগতে মহাত্মা গান্ধী তাঁর পথ-প্রদর্শক সহকর্মী এবং প্রেরণার উৎসস্থল ।

জীবনব্যাপী রাজনীতির জগতের সংশ্লিষ্টতা সত্ত্বেও জওহরলালের ছিল বহুমুখী মননশীলতা । রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি তাঁর যে আকর্ষণ থাকবে এটাই স্বাভাবিক । তাই ভারতের সংস্কৃতি এবং রাজনীতি জগতের এই দুই নেতাই যুবক জওহরলালের গুরুস্থানীয় হয়ে উঠলেন । ভারতের জাতীয় জীবনে গান্ধীজির উদয়কে তিনি 'বজ্র-বিদ্যুতের ঝলকের' মত বলেছেন যা পরাধীন দেশের মানুষকে একই সঙ্গে আলোড়িত এবং আলোকিত করেছিল । আর ভারত-মানসের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে তিনি তুলনা করেছেন পর্বতচূড়ায় ঊষার আলোকের সঙ্গে যার ছড়িয়ে-পড়া প্রভা দেশবাসীর মনের জগতকে উদ্ভাসিত করতে সাহায্য করেছিল । যৌবনে-পাওয়া এই দুই গুরুর সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পরিণত বয়সের জওহরলাল লিখছেন - "I belong to a generation which grew up under his influence. Perhaps we did not fully realize at the time because of the powerful impact of Gandhi's thunderbolt. I speak more for the non-Bengali-speaking people in India, and more especially students and the younger intellectuals who did not have the advantage of reading Tagore in the original Bengali. In Bengal his influence was no doubt deeper and more pervasive because his songs reached the masses of the people".

ব্যারিস্টার হিসেবে জওহরলাল লাহোরের আদালতে কাজ শুরু করেন, কিন্তু দেশের রাজনীতির টান তিনি সর্বক্ষণ অনুভব করতে থাকেন তাঁর পিতার ও পিতার সহকর্মীদের সংশ্লিষ্টতা থেকে । ১৯১৬ সালে তাঁর বিয়ে হয় এবং ১৯১৭ সালে কন্যা ইন্দিরার জন্ম হয় । কিন্তু বিলাসবহুল সংসার-জীবন, যা তাঁর কাছে সহজলভ্য ছিল, তার আকর্ষণ তাঁকে পরাধীন দেশের রাজনীতির কঠোর বাস্তবতা থেকে দূরে রাখতে পারে নি । জালিয়ানওয়ালাবাগের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটে ১৯১৯ এর এপ্রিলে । এই বীভৎস ঘটনার ব্যপক প্রচার বন্ধ করতে সরকার পাঞ্জাবে মিলিটারি আইনকে কাজে লাগিয়ে সংবাদ-মাধ্যমগুলির কণ্ঠরোধ করে । সাধারণ মানুষও অজানা আশঙ্কায় দিশেহারা এবং স্তব্ধবাক হয়ে পড়ে । ঠিক তখনই সারা দেশের হয়ে এই ঘটনার জন্য দায়ী বিদেশী শাসককে ধিক্কার জানিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাইটহুডের খেতাব ফিরিয়ে দেন বড়লাটসাহেবকে লেখা একটি অসাধারণ চিঠির মাধ্যমে । কবির সংগে জওহরলালের তখনও ব্যক্তিগত পরিচয় হয় নি, কিন্তু কবির এই পত্রটি তাঁকে অভিভূত করে । তিনি দেশের রাজনীতিতে কবির প্রভাব এই ভাবে দেখেছিলেন - "রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি জগতের মানুষ ছিলেন না, কিন্তু হৃদয়ের গভীর অনুভূতিশীলতা তাঁকে কবিতা বা সংগীতের ভাবের জগৎ থেকে বারে বারে সরিয়ে এনেছে । যখনই কোন পরিস্থিতি তাঁর অসহনীয় মনে হয়েছে, তখনই তিনি বিদেশী শাসক বা তাঁর নিজ দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎদ্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন । ... জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর নাইট উপাধি ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনা দেশের রাজনীতির জগতকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল" ।

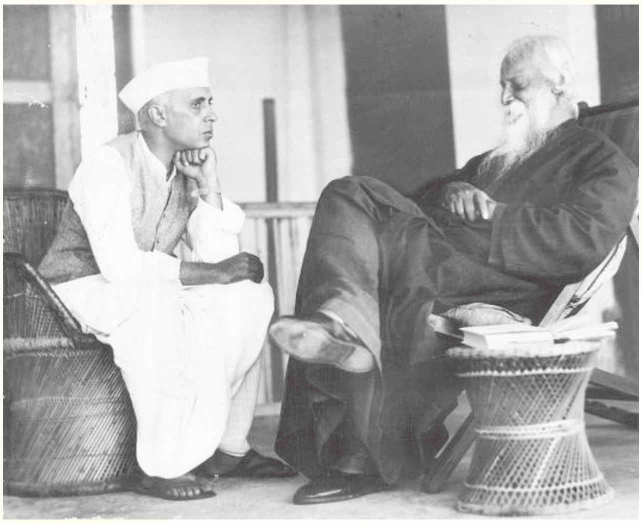

গুরুদেবের সাথে আলাপচারিতায় জওহরলাল

জওহরলালের সঙ্গে কবির প্রথম সাক্ষাতকার কোথায় এবং কবে হয়েছিল তা সঠিক জানা যায় না, তবে ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের একটি অধিবেশন সেরে তিনি গান্ধীজির সঙ্গে শান্তিনিকেতনে যান এবং কয়েকদিন সেখানে কাটান, 'ভবঘুরে' কবি যদিও তখন দেশের বাইরে, ইউরোপে । দীনবন্ধু এ্যান্ড্রুজ ও কবির 'বড়দাদা' ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁরা যে কিছু সময় কাটিয়েছিলেন সে কথা জওহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন । বড়দাদাকে তিনি মনে রেখেছেন "পরম আদরণীয়" (most lovable) বলে । আর এ্যাণ্ড্রুজসাহেব তাঁকে কয়েকটি বই উপহার দিয়েছিলেন যে গুলি পড়ে জওহরলাল উপকৃত হয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন । কবির যুক্তিবাদী মন ও চিন্তার গভীরতা জওহারলালকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল এ কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন । কিন্তু গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনকে, বিশেষ করে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আহ্বানকে, কবি যখন অনুমোদন না দিয়ে সমালোচনা করলেন তখন জওহরলাল কিছুটা বিরক্তি বোধ করলেন (felt a little irritated); কারণ তাঁর মতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গান্ধীজির এই সংগ্রাম ভারতীয়মাত্রেরই সমর্থন করা উচিত ।

বিশ-তিরিশের দশকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, যার কর্ণধার ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, ক্রমশই উত্তাল হয়ে ওঠে । রাজদ্রোহের অপরাধে নেতাদের কারাবাস নিয়মিত বরাদ্দ হয়ে দাঁড়ায় । জেল-জীবনের সহস্র

অসুবিধার মধ্যে, অযাচিতভাবেই, যে বিশাল একটি সুযোগ নেতাদের জুটে গিয়েছিল তা ছিল পড়াশোনা এবং চিন্তা করার অবকাশ । জওহরলাল এমনিতেই পড়ুয়া মানুষ ছিলেন, তিনি জেলে বসে পড়লেন এবং লিখলেন প্রচুর, কবির লেখার সঙ্গেও তাঁর পরিচিতি গভীরতর হল । এর অনেক বছর পরে জীবনের এই পর্যায়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি লিখছেন – "পরবর্তী কালে কবির প্রতি আমার আকর্ষণ বাড়ে । তাঁর চিন্তা ও তাঁর জীবনদর্শনের সঙ্গে আমি যথেষ্ট একাত্মতা বোধ করতে শুরু করি" । তাঁর জীবনে "দুই গুরুর" প্রভাব সম্বন্ধে তিনি আবারও লিখলেন – "আমি চিন্তা করে অবাক হই যে কি ভাবে কবির বিশাল সৃষ্টি এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে এবং আমাদের সময়কে প্রভাবিত করেছিল । কর্মজীবনে গান্ধীজির সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা, কিন্তু তাও আমি বলব আমার মন রবীন্দ্রনাথের সুরেই বিশেষভাবে সাড়া দেয়" ।

শান্তিনিকেতনের প্রতিও তাঁর অনুভূতিশীল মন আকৃষ্ট হয় এবং তিনি কর্মব্যস্ত জীবনে যখনই সময় করতে পেরেছেন কবির সঙ্গে দেখা করতে শান্তিনিকেতনে গেছেন । রিক্ত, নিস্ফলা পারিপার্শিকের মধ্যে শান্তিনিকেতনকে তিনি একটি মরূদ্যান বলে বর্ণনা করেছেন (an oasis in the midst of much barrenness) । কবি শান্তিনিকেতনকে গড়ে তুলছেন নীরবে, প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে, "ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান" হিসেবে, এ কথা জওহরলালের সপ্রশংস দৃষ্টি এড়ায় নি । ১৯৩৪ সালে দুটি বিশেষ ঘটনা জওহরলাল ও রবীন্দ্রনাথকে আবারও কাছাকাছি নিয়ে এল । কন্যা ইন্দিরার স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে কলেজে যাবার সময় আসছে । ১৬ই জানুয়ারী কলকাতা থেকে জওহরলাল কবিকে তার পাঠালেন এই মর্মে যে তিনি ও তাঁর পত্নী শান্তিনিকেতনে আসতে চান কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে । ১৯ তারিখে ট্রেনে এসে পৌছলেন নেহরু-দম্পতি । কবি তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন সাদরে, নিজকণ্ঠে বেদমন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে । বিলেতে শিক্ষিত জওহরলালের সংস্কৃত জ্ঞান ছিল হয়ত স্বল্প, কিন্তু কৌতূহল ছিল অদম্য । তিনি ঐ সংস্কৃত মন্ত্রগুলির ইংরেজি অনুবাদ কবির একান্ত সচিব অনিল চন্দের কাছে চেয়ে পাঠান । বিদায় নেবার সময় তাঁর মন্তব্য লিখে গেলেন – "জীবনের যাত্রাপথের একটি আনন্দময় দিনের স্মৃতিতে" (in memory of a delightful day in life's journey) । নেহরু-পত্নী কমলাও সই করলেন মন্তব্যটির নীচে ।

ইন্দিরাকে শান্তিনিকেতনে পড়ানোর ব্যাপারে নেহরু-দম্পতি কবির সঙ্গে কথা বলেন । যে চিন্তা থেকে তিনি ইন্দিরাকে শান্তিনিকেতনে পাঠাতে চেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত লিখেছেন যার সার-সংক্ষেপ হল - শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া থেকে, এবং বিশেষত, গুরুদেবের উপস্থিতিতে ও তাঁর সাহচর্যে, ইন্দিরা কিছু আহরণ করতে পারবে (she would imbibe something of the atmosphere of the place and, more particularly, profit by the presence of and contact with Gurudev) । নতুন শিক্ষাবর্ষের গোড়ায়, ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে, ইন্দিরা যখন কলেজ-ছাত্রী হিসেবে শান্তিনিকেতনে এলেন জওহরলাল তখন জেলে এবং কমলা নেহরু অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী । কবির সঙ্গে ইন্দিরার প্রথম সাক্ষাত অবশ্য এর আগেও একবার হয়েছিল, সেটা ছিল ১৯৩২ সালে, পুণার যারবাদা জেলে । মহাত্মা গান্ধী তখন সেখানে অনশনে । কবি স্বয়ং এসেছেন তাঁর সমব্যাথী হিসেবে সঙ্গ দিতে; কিশোরী ইন্দিরাও, হয়ত মহাত্মার সেবায় সাহায্য করতে । পিতা জওহরলাল দেরাদুনের জেলখানা থেকে ইন্দিরাকে লিখলেন যে ভারতের আর একজন মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে তাঁর (ইন্দিরার) দেখা হওয়ার সুযোগ হল এটা সৌভাগ্যের ব্যাপার । ইন্দিরা-শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে, জওহরলাল-কমলার কথায় ফিরে যাওয়া যাক ।

কমলা নেহরুর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হওয়ায় তাঁকে এলাহাবাদের বাসস্থান থেকে ভাওয়ালীতে একটি স্বাস্থ্যনিবাসে নিয়ে যাওয়া হয় । জওহরলাল নিজে তখন জেলে । রবীন্দ্রনাথ নিজ-উদ্যোগে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপালকে টেলিগ্রাম করে জওহরলালকে মুক্তি দেওয়ার অনুরোধ জানান যাতে তিনি তাঁর রুগ্ন স্ত্রীর পাশে থেকে তাঁর সেবা করতে পারেন । জওহরলাল আলমোড়া জেল থেকে নিয়মিত তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাওয়ার অনুমতি পান । পরে কমলাকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হয় । কিন্তু যে কালব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন সেই যক্ষা রোগে তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সুইজারল্যান্ডে, মাত্র ৩৬ বছর বয়সে । এই প্রসঙ্গে আলোচনা করার আগে ১৯৩৪ সালের দ্বিতীয় ঘটনা, যেটি রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলালকে আরও কাছাকাছি এনে দিয়েছিল, সেটা কি এবং কেমন ছিল দেখে নেওয়া যাক ।

১৯৩৪ এর ১৫ই জানুয়ারী বিহারের বেশ বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে একটি বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয় যাতে হতাহতের সংখ্যা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিপুল । নেহরু-দম্পতি শান্তিনিকেতন সেরে এলাহাবাদ ফিরে যাওয়ার পথে পাটনায় এসে নামেন এবং কিছুদিন বিহারের ভূমিকম্প-কবলিত কয়েকটি অঞ্চলে ত্রাণের কাজকর্ম পরিদর্শন করেন । এলাহাবাদে ফিরে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য জওহরলাল নানা উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত হয়ে দেশবাসীর কাছে ত্রাণকার্য্যে সর্ববিধ সহযোগিতার আবেদনে ও আয়োজনে নেতৃত্ব দেন ।

ইতিমধ্যে ২৪শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ ভারতের একটি শহরের জনসভায় বিহারের ভূমিকম্পে হতাহত বা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সমবেদনা জানানোর সঙ্গে এই মন্তব্যও করেন যে বিহারের "অস্পৃশতার পাপের" শাস্তি হিসেবে এই ভূমিকম্প বিধাতার রোষের (divine chastisement) প্রতিফলন । বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে মহাত্মার এই উক্তিটি দেশের মানুষের কাছে পৌঁছল অচিরেই । রবীন্দ্রনাথ এই উক্তিটির সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য প্রথমে গান্ধীজিকে লেখেন এবং তাঁর উত্তর পেয়ে এর তীব্র প্রতিবাদ করেন, প্রায় তিরস্কারের স্বরে । গান্ধীজির এই উক্তিটি জওহরলালকেও পীড়া দিয়েছিল । মন্তব্যটিকে তিনি 'বিস্ময়কর' (staggering remark) বলে মনে করেছিলেন এবং এর বিরূদ্ধে কবির প্রতিবাদটির সঙ্গে সহমত পোষণ করে তিনি সেটিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন । কুসংস্কারমুক্ত, বিজ্ঞানসম্মত মানসিকতায় ও বিচারবুদ্ধিতে জওহরলাল আবারও নিজেকে রবীন্দ্রনাথের সহমর্মী ও সহযাত্রী হিসেবে পেলেন । এ কথাটাও প্রসংগত উল্লেখ করা যায় যে গান্ধীজির এই উক্তিটি যখন সারা দেশে নিন্দার ঝড় তুলেছিল তখন তার একাংশের অশোভনতা কবিকে পীড়া দেয় এবং তিনি তার বিরূদ্ধেও প্রতিবাদ জানিয়ে লেখালেখি করেছিলেন । গভীর মতান্তর তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধকে দমাতে যে পারে নি এই ঘটনাগুলি তারই সাক্ষ্য ।

কমলার প্রয়াণ ও বেদনাহত কবির প্রতিক্রিয়া

১৯৩৫ সালের ১৬ই এপ্রিল ছিল আলমোড়া জেল থেকে ভাওয়ালীর স্বাস্থ্যনিবাসে কমলার সঙ্গে জওহরলালের নিয়মিত সাক্ষাৎ করতে আসার একটি দিন । একদিনের এই 'ছুটিতে' গুরুতর অসুস্থ পত্নীর জন্য দুশ্চিন্তা ছাড়াও পিতা জওহরলাল ভাবছিলেন শান্তিনিকেতনবাসী কন্যা ইন্দিরার শিক্ষাজীবনের ভবিষ্যত নিয়ে । কবিকে তিনি চিনেছিলেন অন্তরঙ্গ শুভার্থী হিসেবে । তাই তাঁর মনের কথা কবিকে জানালেন ভাওয়ালী থেকে একটি দীর্ঘ চিঠিতে । তিনি লিখলেন যে খুব শীঘ্রই কমলাকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে নিয়ে যাওয়ার দরকার হবে এবং তিনি নিজে জেল থেকে ছাড়া পাবেন না তাই ইন্দিরাকেই তার মায়ের সঙ্গে যেতে হবে । তিনি জানালেন যে ইন্দিরার মুখ থেকে এবং তার বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে এ কথা জেনে তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত বোধ করেছেন যে গুরুদেবের স্নেহচ্ছায়ায় ও তত্ত্বাবধানে ইন্দিরা শান্তিনিকেতনে নিজেকে ভালভাবে মানিয়ে নিয়ে সুখে আছে । কিন্তু পারিবারিক অবস্থার বাধ্যবাধকতায় ইন্দিরাকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে আস্তে হবে যেটা তিনি নিজে এবং ইন্দিরা মোটেও পছন্দ করছেন না । শান্তিনিকেতনের ছাত্রী হতে পারাটা ইন্দিরার জীবনের একটি বিশেষ গৌরবের ব্যাপার বলে তিনি নিজে এবং ইন্দিরা মনে করেন বলে উল্লেখ করলেন ।

এই চিঠিটির মর্মার্থ কবিকে পীড়া দিয়েছিল । তিনি জওহরলালের চিঠির উত্তর দিলেন ২০শে এপ্রিল, লিখলেন 'ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ইন্দিরাকে আমরা বিদায় দিয়েছি' । তিনি আশা প্রকাশ করলেন যে কমলার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং ইন্দিরা আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে পড়াশোনা শুরু করতে পারবে । কিন্তু কমলা আর সুস্থ হলেন না । ১৯৩৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী যখন তিনি মারা যান তখন জওহরলাল নিজেও তাঁর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন । ইন্দিরা আর ছাত্রী হিসেবে শান্তিনিকেতনে ফিরতে পারলেন না ।

কমলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একবারই সাক্ষাৎ হয়েছিল, কিন্তু সেই তরুণী-কন্যার-মাতা, স্বামীসঙ্গবঞ্চিত যুবতীটির মনের বেদনা তিনি নিশ্চয় বুঝতে পেরে থাকবেন । তাই তাঁর অকাল মৃত্যু কবিকে বিশেষ পীড়া দিয়েছিল । ১৯৩৬ সালের বসন্ত-পূর্ণিমার দিনটিকে (৮ই মার্চ, ২৩শে ফাল্গুন) শান্তিনিকেতন কমলার স্মরণসভা হিসেবে পালন করে । আবেগ-মাখানো দীর্ঘ একটি ভাষণে কবি কমলা এবং জওহরলাল দু জনকেই স্নেহভরে স্মরণ করলেন - "একদিন যখন তাঁর স্বামী কারাগারে তখন দেহের উপর মরণান্তিক রোগের ছায়াঘনায়িত, সেই সময় তিনি তাঁর কন্যা ইন্দিরাকে আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন । ...... সেদিনের কথা আজ মনে

পড়ছে । সেই প্রশান্ত গম্ভীর অবিচলিত ধৈর্যের মূর্তি ভেসে উঠছে চোখের সামনে ... । কমলা নেহরু যার সহধর্মিণী, সেই জওহরলাল আজ সমস্ত ভারতের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারী । " ... । নব বসন্তের পত্র-পুস্প-শোভিত বনরাজির আশ্বাসবাণীতে কবি অনুভব করলেন "যুগসন্ধির নির্মম শীতের দিন শেষ হল, এল নবযুগের সর্বব্যাপী আশ্বাস । আজ এই নব যুগের ঋতুরাজ জওহরলাল" ।

এই ভাষণটির ইংরেজি অনুবাদ পড়ে আবারও অভিভূত জওহরলাল এলাহাবাদ থেকে ১লা এপ্রিল একটি চিঠি লিখে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানালেন সবিনয়ে - "কমলা সম্পর্কে আপনি আপনার অতুলনীয় উদারতায় যে কথাগুলি বলেছেন, তা আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে । ... আপনার আশীর্বাদ পেয়ে আমি কত শক্তি লাভ করি । শক্তি পাই এই কথা ভেবে যে আপনি আমাদের মত পথভ্রান্তদের সঠিক পথে চালিত করার জন্যই আমাদের মধ্যে রয়েছেন" ।

ব্যক্তিগত জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত বা দীর্ঘ কারাবাস জওহরলালের মননশীলতাকে স্তব্ধ করতে পারে নি । কমলার মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই তাঁর জেলে বসে লেখা আত্মজীবনী প্রকাশিত হল । তাঁর বয়স তখন পঞ্চাশও পেরোয় নি । বইটি পড়ে উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্রনাথ জওহরলালকে লিখলেন – "I have just finished reading your great book and I feel intensely impressed and proud of your achievement. Through all its details, there runs a deep current of humanity which overpasses the tangles of facts and leads us to a person who is greater than his deeds and truer than his surroundings".

হাতে লেখা এই চিঠির দুটি মাত্র বাক্যের অসাধারণ প্রশস্তিতে আনন্দিত জওহরলাল উত্তরে লিখলেন - "আপনার প্রশংসাবাণী আমাকে আনন্দিত ও শক্তিশালী করেছে । আপনার আশীর্বাদ পেলে আমি বোধহয় এক বিরূদ্ধ পৃথিবীর সামনে দাঁড়াতে পারি" ।

শান্তিনিকেতনে ইন্দিরা - ক্ষণিকের অতিথি

শান্তিনিকেতনে পৌঁছে ছাত্রী ইন্দিরা গুরুদেবকে প্রণাম জানাতে গেলেন । কবি তাঁকে সম্ভাষণ করলেন তার নামের সঙ্গে "প্রিয়দর্শিনী" বিশেষণটি যোগ করে! ইন্দিরা পরে এই নামটি প্রায়শই তাঁর মধ্যম নাম হিসেবে ব্যাবহার করতেন ।

রবীন্দ্রসান্নিধ্যে ইন্দিরা

শান্তিনিকেতনের ব্যবস্থাদির সঙ্গে ইন্দিরা ভালই মানিয়ে নিয়েছিলেন, নিজের হাতে কাজকর্ম করা এবং সহপাঠীদের সঙ্গে আশ্রমের দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া এই ব্যবস্থার অঙ্গ ছিল । ইন্দিরা ছিলেন লাজুক, মুখচোরা মেয়ে এবং নিঃসঙ্গতায় অভ্যস্ত । শান্তিনিকেতনের খোলা-মেলা অন্তরঙ্গ পরিবেশ তাঁর খুবই পছন্দ হল । তিনি লিখলেন জীবনে এই প্রথম তিনি নিজেকে 'বন্ধন-মুক্ত' বলে অনুভব করছেন । আর চারপাশে কলা ও সংস্কৃতি জগতের দিকপাল সব শিক্ষকেরা, গুরুদেব তো আছেনই । আঁকিয়ে নন্দলাল বসুর কথা ইন্দিরা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন । আর গুরুদেব নিজে যখন পট সাজিয়ে তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে বসতেন, ইন্দিরা পাশ দিয়ে যেতে হলে যেতেন পা টিপে টিপে, পাছে তাঁর কারণে কোন ব্যাঘাত না সৃষ্টি হয় । রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'ক্লাস' নিতেন, খোলা-হাওয়ায় বসে পড়ুয়াদের সঙ্গে নিয়ে গল্প করতেন । একদিন তিনি ইন্দিরাকে জিগ্‌গেসই করে বসলেন - "আমাকে কি তুমি ভয় পাও"? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নামিয়ে ইন্দিরা উত্তর দিলেন "আপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে চাই না" । আর একজন শিক্ষক ইন্দিরার বিশেষ পছন্দের ছিলেন, নাম ফ্র্যাঙ্ক ওবারডর্ফ, জাতে জারমান, পড়াতেন ফ্রেঞ্চ । শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাবার পরে অনেক বছর পর্য্যন্ত ইন্দিরা এই শিক্ষকটির সঙ্গে নিয়মিত পত্র-বিনিময় করতেন । শান্তিনিকেতনের ঋতু-উৎসবগুলি ইন্দিরার প্রিয় ছিল । একবার কবির 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ হল, মুগ্ধ ইন্দিরা কাহিনীটির আদ্যপ্রান্ত সহপাঠীদের কাছে জানতে চাইলেন । কিন্তু ইন্দিরার জীবনের শান্তিনিকেতন পর্ব সুখের হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, এক বছরেরও আগে তাঁকে চলে যেতে হয় । কিন্তু যদিও তাঁর অভিজ্ঞতা অল্পকালের, তাঁর জীবনে শান্তিনিকেতনের প্রভাব হয়েছিল চিরস্থায়ী । সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধায়ের মত সংগীতশিল্পীরা গল্প করতেন যে তাঁদের সঙ্গে দেখা হলেই ইন্দিরা রবীন্দ্রসংগীত শুনতে চাইতেন এবং অনেক সময় কোন বিশেষ গান ফরমায়েস করতেন । 'একলা চল রে' তাঁর অন্যতম প্রিয় গান ছিল । এটির প্রচলিত ইংরেজি অনুবাদগুলি হয়ত তাঁর পছন্দ হয় নি, তাই তিনি নিজে এটির অনুবাদ করেছিলেন, যেটি আন্তর্জালের কল্যাণে এখন সহজলভ্য ।

পাঠকের কাছে মার্জনা চেয়ে দুটি প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিগত স্মৃতি ভাগ করে নিই । আমার এক বন্ধু অশোক চট্টোপাধায় তখন বর্ধমান জেলার জেলা-শাসক । সময়টা বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরের বছর । শান্তিনিকেতনের আচার্য্য হিসেবে ইন্দিরা যাচ্ছেন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে । তাঁর হেলিকপ্টার বর্ধমানে অল্প সময়ের জন্য থামবে এবং তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন এই রকম ব্যবস্থা । সেই সব পর্ব সেরে তিনি অশোকের বাসস্থানে গেলেন এবং বললেন তাঁর কিছু লেখার কাজ আছে । টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা হল । তিনি লিখতে লিখতে অশোককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন রবীন্দ্রনাথের 'সংকোচের বিহ্বলতা' কবিতা/গানটি তার পরিচিত কিনা । ইতিবাচক উত্তর পেয়ে বললেন তাঁকে সেটি পড়ে শোনাতে । অশোক পড়তে শুরু করে যখন 'দুরূহ কাজে নিজের দিও কঠিন পরিচয়' লাইনটিতে পৌঁছেছে, তিনি তাকে থামতে বলে অনুরোধ করলেন ঐ লাইনটি রোমান হরফে তাঁকে লিখে দিতে । তিনি তাঁর শান্তিনিকেতনের বক্তৃতার মধ্যে ঐটি পড়তে চান! আর দ্বিতীয় গল্প ১৯৭০ এর দশকের, তখন আমরা ইংল্যান্ডে থাকি । আমার এক ভাইঝির সমাবর্তনে পৌষ উৎসবের মধ্যে শান্তিনিকেতনে গেছি । অমর্ত্য সেনের মা অমিতা সেনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল লন্ডনে । সে সুবাদে, প্রধানত আমার ভাইঝির ইচ্ছাক্রমে, তাঁদের বাড়িতে গেলাম । অমিতা সেনের মা, আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেনের স্ত্রী, কিরণবালা তখনও জীবিত এবং একই বাড়িতে থাকেন । আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে শ্রদ্ধা জানাতে চাইলাম । অমিতা সেন আগে তাঁর মাকে আমার ইচ্ছার কথাটা জানিয়ে এলেন । তারপর আমাদের সঙ্গে করে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন । তিনি আমাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, "মা, এরা বিলেত থেকে এসেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করে প্রণাম জানাতে চায়" । কিরণবালা বিছানায় বসে, আমরা প্রণাম করলাম । তিনি বললেন "তোমরা অতদূর থেকে এসেছ, ইন্দিরাও এলেই দেখা করে যায়"! জানা গেল পুরণো ছাত্রীটি গুরুপত্নীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যেতে ভুলতেন না ।

ইন্দিরা এরপর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান, সেখান থেকে তাঁর পিতাকে একটি চিঠিতে তাঁর শান্তিনিকেতনের স্মৃতি সম্বন্ধে লেখেন - I was glad of my stay in Santiniketan – chiefly because of Gurudev. In the very atmosphere there, his spirit seemed to roam and hover over one with a loving and deep watchfulness. And his spirit, I feel, has greatly influenced my life and thought" । জওহরলাল ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে লেখা একটি চিঠিতে কবিকে ইন্দিরার এই মন্তব্যটি জানিয়েছিলেন ।

জীবনের অন্তিম পর্ব - কবির শেষ রাগিনীর বীণ

তাঁর জীবনের শেষ চার-পাঁচটি বছর রবীন্দ্রনাথকে নানা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগতে হয়েছিল । কিন্তু শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক পরিধিকে বাড়িয়ে তোলার দায়িত্ব তিনি অবহেলা করেন নি । ১৯৩৭ এর ২৮শে মার্চ চীনাভবনের দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য কবি জহরলালকে আমন্ত্রণ করে লিখলেন - এই কাজের জন্য "তোমার চেয়ে যোগ্য কোন ব্যক্তির কথা ভাবতেও পারি নে" । ইন্দিরাকেও সঙ্গে আনতে বললেন । কিন্তু অসুস্থতার কারণে জওহরলাল আসতে পারলেন না, ইন্দিরাকে পাঠালেন, নিজের একটি শুভেচ্ছাবাণী সমেত - "সশরীরে থাকার মতই আমি আপনাদের সঙ্গে আত্মিকভাবে উপস্থিত থাকব । চীনাভবন চীন ও ভারতের মিলনের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠুক, এই আমার কামনা" ।

ব্রিটিশ সরকারের বিতর্কিত 'ভারত শাসন আইন ১৯৩৫' এর পটভূমিকায় দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া এই বছরগুলিতে ক্রমশই উত্তপ্ত ও অস্থির হয়ে উঠতে থাকে । জওহরলাল সহ অন্যান্য নেতারা ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন । রবীন্দ্রনাথও বাংলার রাজনীতির অস্থিরতা ও হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্কের অবনতি লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন ও পীড়িত বোধ করতে থাকেন । জওহরলাল কলকাতায় এসেছেন কংগ্রেসের মিটিং এ ১৯৩৭ এর অক্টোবর মাসে । কবি তখন কলকাতার উপকণ্ঠে প্রশান্ত মহলানবিশের বাসস্থান বরাহনগরে রয়েছেন । জওহরলাল খবর পেয়ে সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন । মহলানবিশ জানাচ্ছেন যে কবির সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার সঙ্গে সেদিন স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত কি হতে পারে তা নিয়েও জওহরলাল আলোচনা করেছিলেন । ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচিত গানের মধ্যে যে গুলি জাতীয় সংগীতের মর্য্যাদা পেতে পারে তার একটি তালিকা জওহরলাল বা কংগ্রেস পার্টির সংগ্রহে ছিল, যার মধ্যে বাংলায় লেখা 'বন্দে মাতরম্' ও 'জন-গণ-মন'ও ছিল । সেদিন এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত অবশ্যই নেওয়া হয়নি, কারণ জওহরলালের স্মৃতিলিপির থেকে জানা যায় যে ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসের শেষে যখন তিনি শান্তিনিকেতনে যান কবির বিশেষ আমন্ত্রণে হিন্দীভবনের দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য তখনও তাঁর সঙ্গে কবির এই ব্যাপারে কথাবার্তা হয়েছিল । কবির জীবদ্দশায় এটিই ছিল শান্তিনিকেতনে তাঁর শেষবারের মত আসা । তাঁর উপস্থিতির খবর পেয়ে সুভাষচন্দ্র বসু শান্তিনিকেতনে যান এবং দিন-দুয়েক কাটিয়ে ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁরা একসঙ্গে শান্তিনিকেতন ছেড়ে যান । কংগ্রেস পার্টি তথা ভারতের ইতিহাসে ১৯৩৯ সালের ২৯ শে জানুয়ারী তারিখটি একটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ দিন, কারণ ঐ দিনেই সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বারের মত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন, গান্ধীজির আপত্তি সত্ত্বেও । দেশের জটিল রাজনীতি এবং তাঁর নেতৃত্বকে ঘিরে কংগ্রেস পার্টির আসন্ন সমস্যা এই দুই শীর্ষস্থানীয় নেতা নিশ্চয়ই আলোচনা করে থাকবেন । কিন্তু সে অন্য ইতিহাস!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় । জওহরলাল তখন চীনে গেছেন চিয়াং কাই শেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে । যুদ্ধ শুরুর পরিস্থিতিতে সেই সফর ছেড়ে জওহরলাল দেশে ফিরে এলেন । কবি তখন আবারও বরাহনগরে প্রশান্ত মহলানবিশের অতিথি । দমদম বিমান বন্দর থেকে জওহরলাল সরাসরি চলে এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে শ্রদ্ধা জানাতে । অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তাঁর চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কবিকে কিছু জানালেন, এবং অল্প সময় পরেই বিদায় নিয়ে বিমান বন্দরে ফিরে গেলেন । এইটির তাঁদের শেষ দেখা ।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ১৯৪১ সালের ৭ই আগষ্ট, (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮), জওহরলাল তখন দেরাদুন জেলে । এই দুঃসংবাদ জেল-জীবনের নিঃসঙ্গতার মধ্যে তাঁর একাকিত্ববোধকে যে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল তার আভাস পাওয়া যায় তাঁর এই স্মৃতিলিপিতে - "In the solitude of prison life, I felt particularly desolate at the passing of a man who had come to mean so much to me and to vast numbers of others. From an intellectual appreciation of his ideas and his outlook on life, an emotional bond had grown up between us" ।

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে টেলিগ্রাম মারফত তাঁর শোকবার্তা পাঠালেন কবিকে ভারতের আকাশে "সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিস্ক"

(brightest luminary) আখ্যা দিয়ে । প্রাচীন ভারতের মহান ঋষিদের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করে জওহরলাল লিখলেন যে গুরুদেবের উত্তরাধিকার সারা ভারতের অমূল্য সম্পদ যা রক্ষা করার দায়িত্ব ভারতের প্রত্যেকটি মানুষের । কবির জীবদ্দশায় জওহরলাল শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন পাঁচবার, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর দশবার । বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় স্বাধীনতার পরেই, জওহরলাল ছিলেন প্রথম আচার্য্য ।

শেষের কথা

এই ছিল বাঙ্গালী-কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনজন বিখ্যাত অবাঙ্গালী ভারতীয়ের নিবিড় সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত । রবীন্দ্রোত্তর বাংলায় বা ভারতের অন্যত্র কবির প্রভাব আজও অনুভূত হয় কিনা তা মাপজোখ করা সহজ নয় । স্বাধীন ভারতের জাতীয়সংগীতের নির্বাচনে জওহরলাল একাধিকবার কবির সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন এ কথা আগে বলা হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময় ভারতের জাতীয় জীবনে তথা বহির্বিশ্বে রবীন্দ্রনাথের নানা অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জওহরলাল এই ব্যাপারটি স্মরণ করেছিলেন এই ভাবে – I have a feeling of satisfaction that I was partly responsible for this choice [of the national anthem], not only because it is a great national song, but also because it is a constant reminder to all our people of Rabindranath Tagore ।

আসলে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি যেহেতু মানুষের মনের, চিন্তার বা অনুভূতির জগতে, তাই বাংলায় বা বৃহত্তর ভারতে কবির নীরব অনুরাগী নিশ্চয়ই অসংখ্য আছেন বা থাকবেন । সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তাঁর 'নিত্য আসা-যাওয়া' নাই বা থাকল । ■

মা

- শুভা কোকুবো চক্রবর্তী

মা আসছেন । সে-ই এক বছর পর আবার মা আসছেন । মনের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি । আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা কষ্টও থাকে ।

বর্ষাকাল এলেই ঘনঘন মেঘের গর্জনে বুকটা দুরদুর করতো ছেলেবেলায়, তার কিছুক্ষণ পরেই নামতো অঝোরে বৃষ্টি । সেই বৃষ্টি দেখতাম ঘরের জানলার একটা পাট খুলে । দাদু-ঠাকুমা বলতেন মা দুর্গা বাপের বাড়ি আসতে চাইছেন কিন্তু স্বামী মহাদেব রাজি হচ্ছেন না । মহাদেবের সেই রাগটাই হোল মেঘের গর্জন । কিন্তু মা দুর্গা একবছর পর আবার আসবেন বলে কথা দিয়ে গেছেন তার ছেলেমেয়েদের, তাই তিনি কাঁদছেন আর সেই চোখের জলটাই বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে । আমার শিশুমনটা মা দুর্গার কথা ভেবে কেঁদে উঠতো ।

“মা” ডাকটা বড় সহজে আমরা সবাই বলতে পারি, ডাকতেও শিখি সবার প্রথমে । কী সহজ সরল একটা মিষ্টি আদুরে ডাক । আজকাল অবশ্য মাম্মা, মাম্মাম ইত্যাদি অনেকভাবে “মা”কে ডাকতে শেখানো হয় । যেভাবেই শেখানো হোক “মা” কিন্তু থেকেই যায় ।

বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে “মা”এর গভীরতা টের পেতে শুরু করলাম । আমাদের দুইবোনের কখন কার ক্ষিদে পায়, কখন কার শরীরটা ভাল নেই কিংবা মনটা ভারী, তার পুরোটা মা বুঝতে পারেন ঠিক । লুকোতে চাইলেও সম্ভব হয়না কখনও । নিজেদের পড়া ঠিক করছি কিনা, দিদির গান আর আমার নাচের রেওয়াজ ঠিকমত হচ্ছে কিনা, কখন কোন পোষাক পরে বেড়োবো তার ইস্তিরি ঠিক আছে কিনা, ব্যাগে ঠিকমত টাকাপয়সা নিয়ে বেড়োচ্ছি কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি খুঁটিনাটি যাবতীয় দায়িত্ব মা নিয়ে বসে আছেন । অথচ কোনদিন সামনে আসেননি, পিছনে থেকে মেরুদন্ড সোজা করে, মাথা তুলে বাঁচতে শিখিয়েছেন, এগিয়ে দিয়েছেন সবসময় । স্কুল-কলেজে পড়ার সময়, নাচ শিখতে গিয়ে সব জায়গায় বন্ধুদের মায়েদের ভীড় দেখেছি । তারপর নাচ শেখাতে গিয়েও পেরেন্টসদের ভীড় দেখেছি সবসময় । কিন্তু সেই ভীড়ে কোনদিনই মা'কে খুঁজে পাইনি ।

মা'য়ের আলমারিতে পরম যত্নে ভাঁজ করে রাখা মনিপুরি নাচের ঘাঘরা দেখেছিলাম । মা বলতেন দাদু (মায়ের বাবা) অর্ডার করে বানিয়ে দিয়েছিলেন । আমার ভীষণ কষ্ট হোত যে মা আর বিয়ের পর নাচটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি । মানে সম্ভব হয়নি । তাই হয়ত আমাদের যা কিছু শেখার ব্যাপারে এবং সেটাকে যথাযোগ্য করে তোলার ব্যাপারে মায়ের অদৃশ্য কড়া নজর ছিল সবসময় ।

তারপর বিয়ের পর চলে এলাম জাপানে মাকে ছেড়ে, মা'য়ের চোখের বাইরে । কিন্তু মা'য়ের চোখ চলতো আমার সঙ্গে সঙ্গে । শ্বাশুড়িমা আমার কাছে আসবেন । সেকথা মাকে জানিয়েছিলাম । তখন একদম প্রথম প্রথম আমার এখানে সংসার । মা তখনও আসেননি জাপানে । শ্বাশুড়িমায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়নি তখনও । ঠিক নির্দিষ্ট দিনে মায়ের ফোন “শ্বাশুড়িমায়ের যত্ন করবে ঠিকমত” । আমি অবাক হই । ৭০০০কিলোমিটার দূর থেকে মা তার মেয়েকে তখনও যতটুকু সম্ভব শিখিয়ে চলেছেন ।

মায়েরা এমনই হয় । শুধু আমার নয়, ঘরে ঘরে এমন মায়েরাই থাকেন ।

তখন কোলকাতার দূরদর্শনের মাত্র ২টো চ্যানেল । DD1 আর DD2 । তাতেই সবাই মহাখুশি । তারপর এলো কেব্‌ল চ্যানেল । অনুষ্ঠানের ঘটাও বাড়তে থাকলো । রিয়ালিটি শো, নাটক, সিরিয়াল, সিরিয়ালের রিপিট টেলিকাস্ট, সিনেমা । ভোরবেলা থেকে শুরু করে মাঝরাত অবধি । কাজ-কর্মের মাঝে মাঝে বাড়ির মা-কাকীমারা আঁকড়ে ধরতে লাগলেন টিভিকে ।

আচ্ছা? সেলিব্রিটিদের মায়েরা কি অন্যরকম? টিভিতে আজকাল কতরকমের যে প্রোগ্রাম তৈরী হয়! হঠাৎ দেখলাম একটা চ্যানেলে “আমার মা” নামে এক ইউনিক(এই শব্দটা এখন ট্রেন্ড) প্রোগ্রাম তৈরী হোল যেখানে সেলিব্রিটিরা তাদের মায়ের কথা বলছে পরপর এপিসোডে । মায়েরা আসলে আলাদা হয়না । কখনই না । বৈষম্য তৈরী করি আমরা ।

আমার এক বন্ধু “তেজস্বিনীর” কথা বলেছিল । শোনার পর থেকেই বাচ্চাগুলোর সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করছিলাম । কোলকাতা গিয়ে একটা দিন ঠিক করে গেলাম ওদের কাছে । ৫বছর থেকে ১৩/১৪বছর বয়সের ৩৩জন বাচ্চা ওখানে থাকে । ওরা সকালে স্কুলে যায়, বিকেলে ফিরে এসে খেলাধূলা করে, রাতে পড়াশুনো করে । এই “তেজস্বিনী “ সংস্থা ওদের সবকিছু দেখাশুনো করে । ওদের পরিবার থেকেও নেই । অরফ্যান ।

আমি ওখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে কিভাবে সময় কাটাবো এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মাথায় এলো আমি ওদের কয়েকটা জাপানী শব্দ শিখিয়ে আসবো । প্রথম দেখা হবে ওদের সাথে, তাই বুঝতেও পারছিনা ওদের ভাল লাগবে কিনা ।

অবশেষে ওদের সঙ্গে দেখা হোল । একথা সেকথার পর ওদের বললাম, আমি তোমাদের একটা নতুন ভাষা শেখাবো । জাপানীভাষা । ওরা খুব খুশি । সবাই খাতা পেন নিয়ে রেডি হয়ে বসে । আমি ‘সুপ্রভাত’ দিয়ে শুরু করে পরপর প্রায় ৩০টা শব্দ ওদের শেখাই, ওরাও সেগুলো নিজেরা মুখে মুখে উচ্চারণ করতে করতে খাতায় লিখতে থাকে । পড়া পড়া খেলা চলতে থাকে, সময় গড়িয়ে যায় কোথা দিয়ে । ইচ্ছে করেই সেদিন “মা” “বাবা”র জাপানীটা উচ্চারণ করিনি শেষপর্যন্ত । কিন্তু সবচেয়ে ছোট্ট শিশুটা

সরলভাবে বলে ওঠে “মা”কে জাপানীতে কি বলে? জড়িয়ে ধরে বলি ওকাআসান । সঙ্গে সঙ্গে খাতায় লিখে নেয় । “তেজস্বিনী”র বাচ্চাগুলোর কেউ কেউ তাদের মাকে দেখেছে আবার কেউ কেউ দেখলেও হয়ত মুখটাও আর মনে নেই । তবু প্রত্যেকে নিজের নিজের মনে “মা”য়ের একটা ছবি এঁকে রেখেছে । মনটা বড় বিচলিত হয়, অবসন্ন লাগে ।

জন্মের পর থেকে “মা” আদরযত্নে লালনপালন করে মেয়েকে । আর সেই মেয়ে যেদিন শ্বশুরবাড়ি যায়, একমুঠো চাল মাথার উপর দিয়ে ছুঁড়ে বলে যায় “সব ঋণ শোধ করলাম” । কী অদ্ভুত নিয়ম!

“মা” আর সন্তানের সম্পর্কে দেওয়া নেওয়ার হিসেব বা মাপকাঠি থাকেনা জানি । তবু ১১বছর আগে এক মহালয়ার দিনে হঠাৎ “মা” যেদিন চলে গেলেন, ফাঁকা হয়ে গেল চারদিক, শুধু শূন্যতা আর অন্ধকার । সূর্য উঠলেও আকাশটাকে মেঘলা লাগে রোজ । স্বার্থপর মনে হয় নিজেকে । নিয়েই গেলাম শুধু, এক কণাও দিতে পারলামনা তোমাকে মাগো । অবশ্য কী-ই বা তোমাকে দিতে পারতাম ।

যখন দু-চোখ ভরে নামবে আঁধার, তখন যেন দেখি “মা”কে । আমার সকল কথা বন্ধ হলেও মাতৃনামটি যেন থাকে... ■

সেলুলয়েডের চিরুনি

জাপান-বাংলার যোগাযোগের এক পর্যায়

- কাজুহিরো ওয়াতানাবে

কয়েক মাস আগে আমার একজন বাঙালি বন্ধু একটি বাংলা বইয়ের ফটোকপি দেখিয়ে বললেন, পড়ে দেখুন, বেশ ইন্টারেস্টিং বই । তাঁর হাত থেকে কপিটা নিয়ে প্রথম কয়েক পাতায় চোখ বুলিয়ে দেখে রীতিমত অবাক হলাম । বইটির নাম 'জাপান প্রবাস' । মূলত প্রকাশিত হয় এক শতাব্দীরও বেশি আগে, ১৯১০ সালে । অবশ্য আমাকে যে ফটোকপিটা দেখানো হল, সেটি ছিল কলকাতা থেকে প্রকাশিত ভ্রমণ বিষয়ক পত্রিকা 'ভ্রমণ'-এর ২০১৭ শারদীয়া সংখ্যার সঙ্গে বিনা মূল্যে বিতরণ করা পুনর্মুদ্রিত সংস্করণের । বইটির লেখকের নাম মন্মথনাথ ঘোষ, যিনি ১৯০৬ সাল থেকে তিন বছর জাপানে অবস্থান করেছিলেন ।

জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা বইয়ের প্রসঙ্গ উঠলে প্রথমে আমাদের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের জাপান যাত্রী । রবীন্দ্রনাথের জাপান সফরের আগে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হরিপ্রভা তাকেদার 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা'ও এখন পাঠক সমাজে বেশ পরিচিতি লাভ করেছে সাংবাদিক ও লেখক মনজুরুল হকের চেষ্টায় । কিন্তু মন্মথনাথের এই বইয়ের কথা আমার জানা ছিল না ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মন্মথনাথ ঘোষের জন্ম ১৮৮২ সালে, তদানীন্তন যশোর জেলার মথুরাপুর গ্রামে । তিনি যশোরের নলডাঙ্গার রাজা প্রমথভূষণ দেব রায়ের আনুকূল্যে ১৯০৬ সালে জাপানে কারিগরির প্রশিক্ষণের জন্য আসার সুযোগ পান । জাপানে তিন বছর থেকে তিনি বোতাম, কৃত্রিম চামড়া, ছাতা ও লাঠির হ্যান্ডেল এবং সেলুলয়েডের জিনিস তৈরির দক্ষতা লাভ করেন । স্বদেশে ফিরে তিনি চিরুনি তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন এবং একজন সফল শিল্প-উদ্যোক্তা হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন ।

'জাপান প্রবাস' থেকে আমরা জানতে পারি, ১৯০৬ সালে তাঁর সঙ্গে আরো যে ১৫ জন ভারতীয় যুবক জাপানে এসেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশ ছিলেন বঙ্গভূমির সন্তান । এই দলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন । রথীন্দ্রনাথ অবশ্য জাপান থেকে শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান সেখানে কৃষিবিদ্যা নিয়ে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে ।

কলকাতা বন্দর ছাড়ার পর মন্মথনাথরা রেঙ্গুন, পেনাঙ, সিঙ্গাপুর, হংকং হয়ে জাপানের ইয়োকোহামা বন্দরে এসে পৌঁছান ১৯০৬ সালের ৩০শে এপ্রিল । একই দিন রাতে তাঁর দল ট্রেনযোগে টোকিওতে (মন্মথনাথ তাঁর বইতে 'টোকিও' না লিখে 'তোকিও' লিখে থাকেন এই কারণে যে "জাপানীরা 'ট' ও 'ল' উচ্চারণ করিতে পারেন না । সুতরাং তাহারা টোকিও না বলিয়া তোকিও বলিয়া থাকেন । ") চলে আসেন ।

মন্মথনাথের বইয়ের বহু জায়গায় তাঁর চোখে পড়া জাপানিদের মনোভাব এবং ব্যবহার নিয়ে তাঁর নিরীক্ষণের উল্লেখ পাওয়া যায় । এ-রকম প্রথম দৃষ্টান্ত মাল-চুরি সম্বন্ধে । জাপানে বহু দিন থাকার পরিকল্পনা নিয়ে আসার কারণে স্বভাবতই তাঁদের কাছে প্রচুর মালপত্র ছিল । এ-প্রসঙ্গে তিনি লেখেন;

"জাপানে মালপত্র সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতে কিছু মাত্র অসুবিধা নাই । কারণ রেলে কোনও দ্রব্য চুরি হয় না । বাক্সে তালা চাবি না থাকিলেও কোনও ভয় নাই । ষ্টেসন যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, ইচ্ছা করিলে ভ্রমণকারীগণ তাঁহাদের স্ব স্ব মাল পার্শেল আফিসে জমা দিয়া রসিদ লইতে পারেন । " এই উল্লেখ পাওয়া যায় পুনর্মুদ্রিত "জাপান প্রবাস" বইয়ের ২৬ পৃষ্ঠায় । পরের পাতায় পথচারীদের বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন;

"রাস্তাটি লোকে লোকারণ্য, কিন্তু রিক্সার খড়খড়ি, ফেরিওয়ালার ঘণ্টার ঠনঠনি এবং ধীবরে বাঁশীর পোঁ পোঁ ব্যতীত কাহারও মুখে কোনও উচ্চ বাক্য নাই । বোধ হইতে লাগিল যেন জাপানীরা উচ্চস্বরে কথা বলিতে জানেন না । "

এই উল্লেখ আমাদের মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের 'জাপান যাত্রী'-র সেই বর্ণনা, যেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন;

"একটা জিনিস এখানে পথে ঘাটে চোখে পড়ে । রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নেই । এরা যেন চেঁচাতে জানে না, লোকে বলে জাপানের ছেলেরা সুদ্ধ কাঁদে না । আমি এপর্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখি নি । পথে মোটরে করে যাবার সময়ে মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি বাধা এসে পড়ে, সেখানে মোটরের চালক শান্তভাবে অপেক্ষা করে; গাল দেয় না, হাঁকাহাঁকি করে না । পথের মধ্যে হঠাৎ একটা বাইসিকল মোটরের উপরে এসে পড়বার উপক্রম করলে, আমাদের দেশের চালক এ অবস্থায় বাইসিকল-আরোহীকে অনাবশ্যক গাল না দিয়ে থাকতে পারত না । এ লোকটা ভ্রূক্ষেপমাত্র করলে না । "

রেলওয়ে স্টেশনে দেখা দৃশ্য মনে হয় মন্মথনাথের অত্যন্ত অভিনব লাগত । তাঁর কথায়;

"জাপানীদিগের আর একটী গুণ নবাগত ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি পথে পতিত হয় । রেল কিম্বা ট্রামের যাত্রীসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইলেও টিকিট লইবার কিম্বা গাড়ীতে আরোহণ করিবার সময় একটু মাত্র গোলমাল হয় না । যিনি আগে আসিবেন তিনিই আগে টিকিট পাইবেন এবং গাড়ী চড়িবেন । সাধারণতঃ যাত্রিগণ সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন । "(৩০ পৃষ্ঠা)

ট্রেনে চড়ার আগে প্ল্যাটফর্মে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা বর্তমান জাপানে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার । সাধারণত ভাবা হয়ে থাকে যে জাপানিদের এই অভ্যাস দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই শুরু হয়েছে । মন্মথনাথ এই বর্ণনার মাধ্যমে যদি সেই কথা বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে বর্তমান যুগের জাপানিদের মধ্যে প্রচলিত ধারণাকে পালটে দিতে পারে । ট্রেনের আরোহীদের নিয়ে তিনি আরো লেখেন;

"গাড়ীতে আরোহণ করিবার পর যদি বসিবার স্থানের অভাব হয়, তাহা হইলে যুবকগণ স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া তথায় বয়োবৃদ্ধ কিম্বা স্ত্রীলোকদিগকে বসাইয়া দেন । " সে যুগের যুবক-যুবতীদের হাবভাব নিঃসন্দেহে বর্তমানকালের তরুণ প্রজন্মের চেয়ে বেশি প্রশংসার দাবিদার । আজকাল ট্রেনে বয়স্কদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কতজন তরুণ-তরুণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের আসন ছেড়ে দিতে চাইবে?

মন্মথনাথের কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রথম পর্ব হয়েছিল কোবেতে । সেখানে তিনি তাঁর সফরসঙ্গী একজন বাঙ্গালি বন্ধুর সঙ্গে বোতাম তৈরির কাজ শিখলেন । যে কারখানায় তাঁদের প্রশিক্ষণ চলত, সেখানকার নিকটবর্তী বোর্ডিং-এ তাঁরা থাকতেন । সেখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও জাপানি ধাঁচের রন্ধন প্রণালিতে প্রস্তুত রান্না তাঁর রুচি-সম্মত হয় নি, তবু সেগুলো খাওয়া ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর ছিল না । প্রথম দিকে জাপানি পদগুলো অসহ্য লাগত তাঁদের ।

"কোবে থাকিতে জাপানী প্রথার রন্ধন কখনও খাইতে চেষ্টা করি নাই; কারণ উহার তীব্র গন্ধ আমাদের আদৌ সহ্য হইত না । আমার বন্ধু

শ্রীযুত সেন মহাশয় বাস্তবিকই বলিতেন যে জাপানীরা যাহা খান তাহাতেই ‘কুছুরী’ অর্থাৎ ঔষুধ মিশ্রিত করেন । ...বোর্ডিং-এ থাকিবার সময় অনেক সময়েই রন্ধনকালে নাকে কাপড় বাঁধিয়া দ্বিতলের উপর বসিয়া থাকিতাম কিম্বা গন্ধ অতি বিকট হইলে গৃহের বাহিরে গিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতাম । ” অবশ্য পরবর্তীতে “যে খাবার এককালে এতই ঘৃণিত বোধ হইয়াছিল, কালক্রমে আমি তাহার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলাম । ” (৪১ ও ৪২ পৃষ্ঠা)

কোবেতে প্রশিক্ষণ শেষে মন্মথনাথ ওসাকায় চলে যান । উদ্দেশ্য, সেলুলয়ড নিয়ে শিক্ষা অর্জন করা । মন্মথনাথের লেখা অনুযায়ী, তখন জাপানে একটি মাত্র সেলুলয়ডের জিনিস তৈরি করার কারখানা অবস্থিত ছিল ওসাকায় । কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষ থেকে আগত এই শিক্ষানবিশ গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন । মন্মথনাথ অগত্যা ব্রিটিশ দূতাবাসের মাধ্যমে ওসাকার গভর্ণর সহ প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাহায্য চাইলেন । তাদের চাপে কারখানার মালিক মন্মথনাথকে একবার কারখানাটি ঘুরে দেখার অনুমতি প্রদান করলেও তিনি এই ভারতীয় যুবককে সেলুলয়েড তৈরির বিশদ তথ্য দিতে রাজি হন নি । মালিকের এই অনীহার পিছনে একটা কারণ ছিল; সেই সময় সেলুলয়ড উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইউরোপ সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অব্যাহত থাকলেও জাপান এই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে পেরেছিল । এর কারণ জাপান তাইওয়ান থেকে সেলুলয়েডের মূল উপাদান কর্পূর (camphor)-এর স্থিতিশীল সরবরাহ পেতে সক্ষম ছিল । তাইওয়ানে কর্পূর গাছের বিশাল বন ছিল । চীনের সঙ্গে যুদ্ধে জয় লাভ করার পর ১৮৯৫ সালে জাপান তাইওয়ানকে চীনের কাছ থেকে হস্তগত করে । এতে যথেষ্ট পরিমাণে camphor-এর সরবরাহের পথ সুগম হয় । সেলুলয়ড উৎপাদনে জাপান এই অনুকূল পরিস্থিতি ধরে রাখতে চেয়েছিল । আবার, জাপানের মধ্যেও বেশ কয়েকজন শিল্প-উদ্যোক্তা সেলুলয়ড উৎপাদনে আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন । সুতরাং ওসাকার সেই ব্যবসায়ী মন্মথনাথকে গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করলেন । কিন্তু মন্মথনাথ অনায়াসে হাল ছাড়ার পাত্র ছিলেন না । তিনি পরের দিন আবার ওসাকায় গিয়ে কারখানাটির মালিকের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত জানালেন । তাঁর কথা শুনে মালিকের স্ত্রী বললেন;

“পুরাকালে ভারতবর্ষ যখন উন্নত ছিল তখন আমরা সমস্ত বিষয়ে তথা হইতে শিক্ষা করিয়াছি । এমন কি আমাদের আচার ব্যবহার পর্য্যন্ত আপনাদের অনুকরণ মাত্র । আপনাদের দেশ হইতে ধর্ম্মালোক না পাইলে আমাদের বোধ হয় অস্তিত্বও থাকিত না । সে যাহা হউক, আপনি যখন এতদূর আসিয়াছেন তখন আপনার শিক্ষা ব্যবস্থা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য । ” (৪১ পৃষ্ঠা) এই বলে তিনি তাঁর স্বামীকে বুঝিয়ে মন্মথনাথের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেন ।

এই কারখানায় লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মন্মথনাথ দেশে ফেরার পর যশোরে চিরুনির কারখানা গড়ে তোলেন এবং এতে বিপুল সাফল্য অর্জন করেন ।

আমার এই প্রবন্ধের এখানে ইতি টানতে পারতাম, কিন্তু এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন ।

‘জাপান প্রবাস’ পড়ার পর একদিন আমি আমার ঘরে ঢুকলাম একটা বই খুঁজতে । আমার ঘর হলেও আমার স্ত্রী ঘরটাকে গুদাম ঘর হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে এবং ঘরটি এখন জামা, খালি বাক্স, পুরনো খেলনা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ এবং মেঝেতে পা ফেলাও দুষ্কর হয়ে গেছে । তাই আজকাল ধুলোয় ভরা এই ঘরে খুব কমই পড়ে আমার পদধূলি । সে যাই হোক, সেদিন বই খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একটা বইয়ের উপর আমার চোখ পড়ল । বইয়ের নাম ‘জাপান জাপানী-সেকাল একাল’ । আর প্রচ্ছদে লেখকের নাম; মন্মথনাথ ঘোষ ও কুমারেশ ঘোষ । কয়েক পাতা উল্টিয়ে দেখে বুঝতে পারলাম, বইটির সম্পাদনা করেছেন মন্মথনাথের পুত্র কুমারেশ । কুমারেশ ১৯৭০ সালে জাপানে বেড়াতে আসেন মূলত সে বছর ওসাকাতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব প্রদর্শনী (Expo ‘70) দেখতে । তিনি সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখেন এবং সেটি বইয়ের আকারে প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর পিতৃদেবের পুরনো লেখা ‘জাপান প্রবাস’ও পুনর্মুদ্রণ করে সেখানে সংযোজন করেন ।

বইটি কবে, কখন, কিভাবে আমার ঘরে এল? আদৌ মনে করতে পারছি না । তবে এ-কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে বইটি আমার সঙ্গে একই ছাদের নিচে কয়েক দশক ব্যাপী দীর্ঘ নিদ্রায় নিমজ্জিত ছিল এবং

কোনো কারণে সেই ঘুম ভেঙ্গে গেল ।

কুমারেশের লেখা থেকে জানতে পেরেছি যে মন্মথনাথ ১৯৩০-এর দশকে আবার জাপানে গিয়েছিলেন । বহু দিন জাপানে বসবাসের মাধ্যমে তিনি ভাল জাপানি ভাষা আয়ত্ত করতে সক্ষম হন । শুধু তিনি নন, তাঁর সঙ্গে যে সব বাঙালি সন্তান ১৯০৬ সালে জাপানে পাড়ি জমিয়েছিলেন, দেশে ফিরে আসার পরও সপ্তাহে একদিন নিয়মিতভাবে “নিজেদের বাড়ি থেকে খাবার তৈরি করে নিয়ে গঙ্গার ধারে বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে—এবং নিজেদের মধ্যে গল্প করতেন জাপানী ভাষায় । ” (কুমারেশ ঘোষ; আমার কথা)

তাঁরা জাপানে তৎকালীন নতুন প্রযুক্তি শিখতে এসেছিলেন । কিন্তু তাঁরা শুধু বাস্তব জ্ঞান শিখে যান নি; সেই সঙ্গে জাপানের প্রতি ভালবাসা নিয়ে দেশে ফিরলেন । তা না হলে তাঁরা এভাবে জাপানি ভাষা ভুলে না যাওয়ার চেষ্টা করতেন কেন?

আমার ধারণা ছিল যে আধুনিক যুগে বাংলার সঙ্গে জাপানের যোগাযোগ ১৯০১ সালে চিন্তাবিদ তেনশিন ওকাকুরার কলকাতা গমনের মাধ্যমে শুরু হয় । তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব দুই পক্ষের যোগাযোগের নতুন অধ্যায়ের উন্মোচন সূচিত করে বলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সাংস্কৃতিক বিনিময়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, এইরকম মনে করতাম । কিন্তু মন্মথনাথের লেখা পড়ে বুঝতে পারলাম; ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দু-দেশের মধ্যে সংস্কৃতি ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সক্রিয় তৃণমূল পর্যায়ের যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল । এই প্রবন্ধ লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আরেকটা পুরনো বইয়ের সন্ধান মেলে । সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘জাপান’ নামক এই বইটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে, অর্থাৎ মন্মথনাথের ‘জাপান প্রবাস’ বইয়ের সঙ্গে একই বছরে । ‘জাপান’ বইটির লেখক জাপানে এসে এক বাড়িতে যান এবং সেখানে বেশ কয়েকজন বাঙালি বাস করতেন বলে জানা যায় ।

আরো বহুবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে জাপান ও বাংলার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে । মন্মথনাথের লেখা পড়ে আমার এমনটা মনে হল । ■

রবীন্দ্র রচনায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব

- আলপনা ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে মুখ্যত কবি বলে অভিহিত করতে ভালবাসতেন । তিনি ছিলেন বিশ্বকবি । এই বিশ্বকবিত্ব ছিল এক গভীর জীবনদর্শনের ফসল । আমরা জানি তাঁর এই জীবনদর্শন উপনিষদের প্রভাবে প্রভাবিত চিরন্তন (শাশ্বত) সৌন্দর্য্য-বোধে উদ্ভাসিত । কবি শুধুমাত্র কবি ছিলেন না । আলোকিত সৌন্দর্য্যের উপাসক রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তার প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবের অর্ন্তনিহিত মনলোকের জাগৃতি ঘটাতে চেয়েছেন তাঁর লেখনীর দ্বারা । মানুষ যে দীন হীন দৈবাধীন পদার্থ নয় একথা কবির বিভিন্ন রচনায় বার বার ধ্বনিত হয়েছে ।

উপনিষদ কবিকে শিখিয়েছে স্বার্থত্যাগের দ্বারা, উদারতার আহ্বানে নিজেকে উন্নত করার শিক্ষা । উপনিষদ জানিয়েছে সবার মাঝে দেবতা আছেন । জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ ইত্যাদির বুদ্ধি মানুষের দেবত্বকে নীচে নিয়ে আসে, আর এই কারণেই ভারততীর্থ কবিতায় দ্বিধাহীন চিত্তে আহ্বান জানালেন ---

"এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত কর অপনীত সব অপমান ভার"---

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে বিভোর বিভ্রান্ত ভারতবর্ষের ঘুম ভাঙ্গানোর চেষ্টায় উৎপত্তি হোল উপনিষদ আশ্রিত 'ব্রাহ্মধর্ম', যার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ । ঠাকুরবাড়ী কেবলমাত্র উপনিষদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল না, সেখানে বৌদ্ধধর্মেরও চর্চা হ'ত, ধর্ম না বলে 'শাস্ত্র' বলা সমীচিন হবে । মহর্ষীর পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ 'বৌদ্ধধর্ম' নামে (১৯০১) একটি পুস্তক লেখেন । এছাড়া খুব অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ রাজেন্দ্রলাল মিত্র দ্বারা প্রভাবিত হন, যার ফল পরবর্তীকালের অসংখ্য রবীন্দ্র রচনা । তাঁর 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে 'বুদ্ধদেব' নামক রচনাটির প্রথমেই কবি লিখেছেন, "আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি, আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি । এ কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলংঙ্কার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বার বার সমর্পণ করেছি, সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি" ।

রবীন্দ্র কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ সবই বুদ্ধের মহিমায় উদ্ভাসিত । বুদ্ধদেব কোথাও নিজেকে অবতার ব'লে ঘোষণা করেননি, তিনি মানব ও মানবতাকে বড় ক'রে দেখেছেন । বুদ্ধদেব জাতিভেদ মানেননি, যাগযজ্ঞের বাহ্যিক আড়ম্বর মুক্ত এক শ্রেয়বোধ, অহিংসা, ত্যাগ, করুণা, বৈশ্বমৈত্রী, ঐক্য এবং সংহতির সহায়তায় মানুষকে অন্তর্নিহিত আত্মশক্তির কথা শিখিয়েছেন । আমাদের বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যখন একাধারে আচার সর্বস্ব জাগযজ্ঞের বাহ্যাড়ম্বরে ব্যাপৃত এবং কঠিন দার্শনিক তত্ব প্রচারে ব্যাস্ত ছিল তখন বুদ্ধদেব অতি সাধারণ ভাষায়, জনগণের জীবনে তাত্বিকতার ব্যবহারে সমৃদ্ধ দয়া, করুণা, ত্যাগ, মৈত্রী ও অহিংসার বাণী বহন ক'রে আনলেন ।

আমরা জানি, বুদ্ধ পৃথিবী দুঃখময় বলেছেন । অপর দিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ --- মানসলোকে এই বৈপরীত্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব পরিক্রমার লক্ষ্য ত্যাগ, অহিংসা, দয়া, করুণা ও মৈত্রীর বাণী, অর্থাৎ তাঁর ভারতবর্ষের সংস্কৃতির প্রচার । এক কথায় বলা চলে, সারা বিশ্বে ভারতবর্ষের অন্তরাত্মার বাণী ছড়িয়ে দেবার জন্য বরীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রথম ভারতীয় দূত । উপনিষদ কবিকে শিখিয়েছে --- "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভুতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তী, আনন্দং প্রয়ন্তিভিসং বিশন্তি চ" ।

ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব মিলিয়ে কবি পঞ্চাশটিরও বেশী নাটক লিখেছেন । ভারতীয় পৌরাণিক আখ্যানাশ্রয়ী নাটকের চাইতে বৌদ্ধ যুগের বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বনে তাঁর লিখিত নাটকের সংখ্যা অধিক । বৌদ্ধ যুগের কাহিনী ভিত্তিক নাটকগুলিকে কবি বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত করে লিখেছেন । অপর দিকে পৌরাণিক কাহিনী আশ্রয়ী নাটকগুলিতে সেভাবে পরিবর্তন ঘটাননি । রবীন্দ্রনাথ তাঁর "রাজা' (১৯১০) নাটকটিকে চারবার পরিবর্তিত করেছেন । এই নাটকটি মহাবস্ত অবদানের অন্তর্গত কুশ জাতক অবলম্বনে রচিত । ১৯২০ সালে নাটকটির অভিনয়যোগ্য রূপ "অরূপরতন" সৃষ্টি করলেন । ১৯৩১ সালে এই একই বিষয় নতুন ভাবে উপস্থাপিত করেছেন "শাপমোচন" কবিতা ও "শাপমোচন" কথিকায় (১৯৩১) । মানুষের বাইরের রূপ মূল্যহীন, অন্তরের সৌন্দর্য্যই আসল, এই ছিল মূল বক্তব্য ।

বৌদ্ধকাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রথম নাটক ছিল 'মালিনী' (১৮৯৬) সত্যকাহিনী অবলম্বনে, কাল্পনিক চরিত্রের সহায়তায় বৌদ্ধধর্মের কালজয়ী মহিমা অর্থাৎ ত্যাগ ও সত্য বিকশিত করেছেন নাটকটিতে ।

'অচলায়তন' (১৯১২) নাটকটি 'দিব্যাবদান মালা'র অন্তর্গত মহাপঞ্চক ও পঞ্চক এই দুই ভাইয়ের কাহিনী । এই নাটকটি লিখে রবীন্দ্রনাথ বিপুল সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন – নিন্দা বেশী হলেও প্রশংসাও কম ছিলনা । এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ জীর্ণ পুরাতন আচার অনুষ্ঠানকে পরিত্যাগ করে নূতন ভাবে তাকে গড়ার কথা বলেছেন ।

১৯২৬ সালে 'নটীর পূজা' রচনা করেন ১৮৯৯ এ তাঁরই লেখা 'পূজারিনী' কবিতা অবলম্বনে ।

১৯৩৩ সালে লিখিত 'চণ্ডালিকা' নাটকটি শার্দুলকর্ণ অবদানের কাহিনী অবলম্বনে রচিত । পাঁচ বছর পরে (১৯৩৮) এটির পরিবর্তন সাধন করে নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা' উপহার দেন আমাদের ।

রবীন্দ্রনাথ 'পরিশোধ' কবিতা রচনা করেন ১৮৯৯ সালে । সুদীর্ঘ ৪০ বছর পরে ১৯৩৯ সালে সেই কাহিনীর পুনরাবর্তন ঘটান শ্যামা নৃত্যনাট্য রচনা করে । শ্যামা নৃত্যনাট্যে ক্ষমার আদর্শ প্রস্ফুটিত হয়েছে করুণ রস সঞ্চারে ।

রবীন্দ্রনাথের 'কথা' (১৯০০) কাব্যের অন্তর্গত বৌদ্ধ আখ্যানমূলক কবিতাগুলিতে বৌদ্ধ ধর্মাদর্শ অতি সুন্দর রূপে ধরা দিয়েছে । এই কাব্যে কবি সন্ন্যাসী উপগুপ্ত'র যে চরিত্র চিত্রণ করেছেন তাতে করুণার যে মহিমা প্রকাশ পেয়েছে তা আমাদের চিত্ত বিগলিত করে দেয় । 'শ্রেষ্ঠ দীক্ষা' কবিতায় দেখা যায় ভিক্ষাপ্রার্থী অনাথপিণ্ড ধনবানের মনিমাণিক্য নয়, হত দরিদ্র নারীর একমাত্র ছিন্ন বসনটিকেই শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা রূপে গ্রহণ করলেন । 'সামান্য ক্ষতি' কবিতাতেও বৌদ্ধ যুগের রাজন্যবর্গের ন্যায়ধর্ম পালনার্থে স্বীয় প্রিয়তমার অন্যায় আচরণ প্রশ্রয় পায়নি । 'মূল্যপ্রাপ্তি'তে ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কের মহিমা কীর্তন করেছেন । 'নগরলক্ষ্মী', 'মস্তকবিক্রি' এই কবিতাগুলোতেও কবি সাহস, ত্যাগ, আত্মত্যাগের অপরূপ মহিমা গাঁথা গেথেছেন ।

এই কবিতাগুলো পড়বার কালে কেবল মাত্র বুদ্ধ আদর্শ আমাদের আপ্লুত করেনা, চোখের সামনে ভেসে বেড়ায় সেই যুগের ইতিহাস এবং ভৌগলিক চিত্র । সর্বত্র যেন প্রত্যক্ষ করি ভগবান বুদ্ধের কল্যাণ সুন্দর স্পর্শ ।

ব্রাহ্মণ্য সমাজ সৃষ্ট জাতিভেদ, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি ব্যাধি যখন ভারতীয় সমাজকে অথর্ব করে তুলেছিল, বুদ্ধদেব তখন জন্মকৌলীন্যকে অস্বীকার করে মানুষকে ঐক্য ও মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মন্ত্রে জাগ্রত করেছিলেন । বৌদ্ধধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার অন্যতম কারণ ঐক্য ও মৈত্রী বন্ধনে জাগ্রত মানবিকতার আহ্বান । রবীন্দ্র সাহিত্যে নানাভাবে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার উল্লেখ লক্ষ্যণীয় । 'কালান্তর' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "আমাদের দেশের সহস্র সহস্র লোক মানুষ হয়েও পশু'র মত পীড়িত অবমানিত, আবার বিদেশী কোন সাধু ব্যক্তিকেও আমাদের দ্বারস্থ কুক্কুরের ন্যায় মনে মনে দুরস্থ করিতে ইচ্ছা করে" । আমরা 'গোরা' উপন্যাসে পড়ি পরেশবাবু বলছেন, "একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোন দোষ হয়না, অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়, মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান ও ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে অধর্ম না বলে কি বলব"? এই উপন্যাসেই দেখি হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী গোরা যখন জানতে পারে সে হিন্দু নয় সে খ্রীষ্টান তখন সে পরেশবাবুকে বলে "আমি আজ ভারতবর্ষীয় । আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কোন

সমাজের কোন বিরোধ নেই । আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন । ... আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আমার আর অপবিত্রতার ভয় রইল না । ... মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে এতদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি । তার পরে গোরা আনন্দময়ীর কাছে গিয়ে বলল "মা, তুমিই আমার মা । তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই, শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা । তুমিই আমার ভারতবর্ষ" । আনন্দময়ীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের ভারতবর্ষ । রবীন্দ্রনাথের গোরার সমকালীন রচনা 'ভারততীর্থ' এবং 'অপমানিত' কবিতা দুটিতেও আমরা জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বিরোধী রবীন্দ্রনাথকে পাই ।

রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' রচনায় অর্থাৎ ভারতের জাতীয় সঙ্গীতেও দেখি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেন কবি ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য ভারতবর্ষকে চালনাকারী চিরসাথীর উদ্দেশ্যে লিখলেন, "অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী/ হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী ..." ।

কবির বিশ্বভারতী সৃষ্টির মূলেও ছিল ঐক্য, মৈত্রী, প্রেম এবং ত্যাগের মহিমা প্রচার । রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'যাত্রার পূর্বপত্র' (১৯১২) রচনায় 'পথের সঞ্চয়' প্রবন্ধে লিখেছেন, "ভারতবর্ষ সেদিন ধর্মের দ্বারা কেবল আপনার আত্মা নহে পৃথিবীকে জয় করিতে পারিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিকতার তেজে ঐহিক পারত্রিক উন্নতিকে একত্রে সম্মিলিত করিয়াছিল । তখন য়ুরোপের খৃষ্টান সভ্যতা স্বপ্নের অতীত ছিল" ।

দ্রষ্টব্য :- "ধর্মের দ্বার" অর্থে সম্রাট অশোক কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের কথা লিখেছেন প্রবন্ধে ।

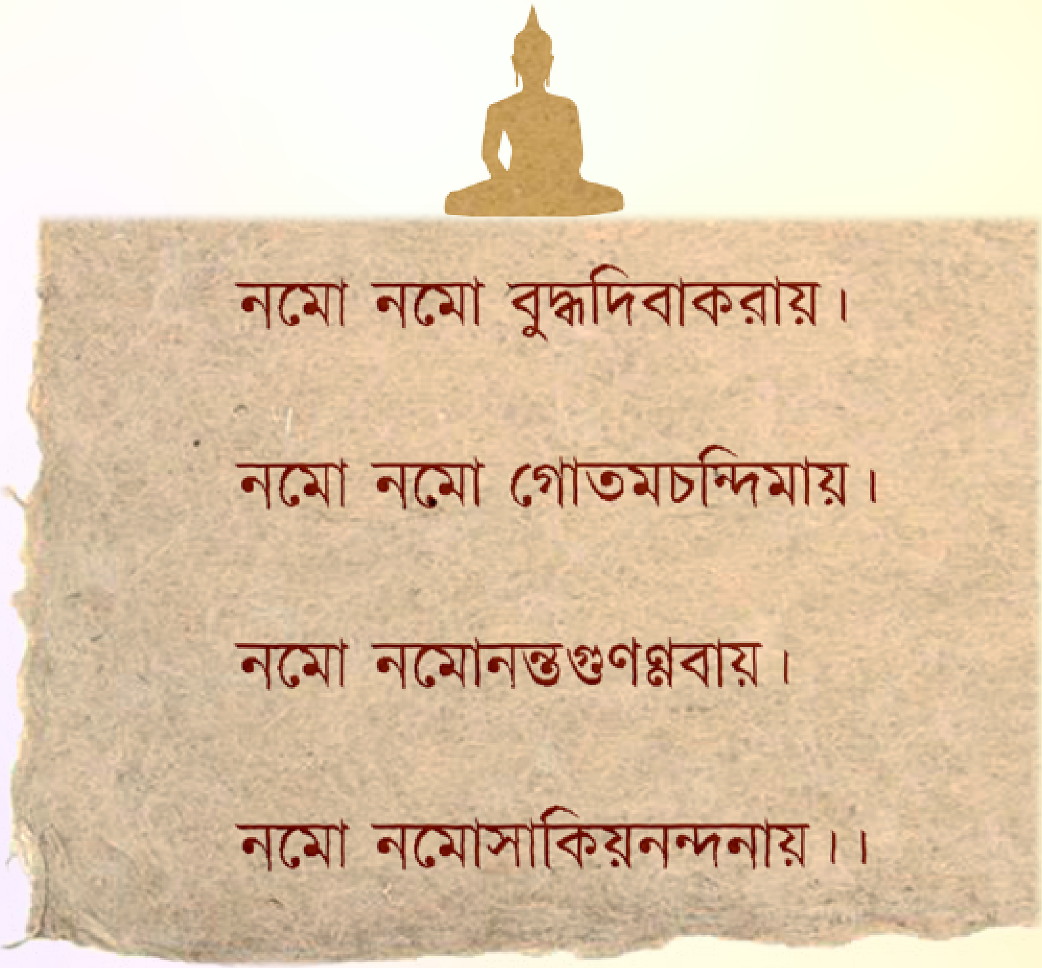

বাঙ্গালী ভদ্রলোক

- তপন কুমার রায়

ভদ্র কথাটার অভিধানগত ব্যাখ্যা হল সাধু, শ্রেষ্ঠ বা ঋগ্বেদ অনুসারে কল্যাণকর । অভিধানে যাই থাকুক না কেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষে কিন্তু আরেকটি ব্যাখ্যা আছে তা হল 'কল্যাণাচারে যাহার পাপ প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ যে গোপনে পাপ করে ও বাহিরে সদাচারে তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া পরধন গ্রহণ করে তাদৃশ ব্যক্তি' ।

বাঙালী সমাজে তথাকথিত 'ভদ্রলোক'এর সৃষ্টি হয়েছিল প্রথাগত কিছু সামাজিক অনুশাসন মেনে চলা মানুষদের নিয়ে । যারা এগুলি মেনে চলতেন তারাই সে সময় চিহ্নিত হতেন 'ভদ্রলোক' হিসেবে । এর সঙ্গে এই তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণীভুক্ত মানুষদের শিক্ষা, সংস্কৃতির বা পারিবারিক প্রেক্ষাপট কোনটাই বিচার্য হত না । এখন প্রশ্ন হল এই সামাজিক নিয়ম কানুন বা বিধি নিষেধ কে বা কারা কোন সময়ে তৈরি করেছিল । ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে ইংরেজরা যখন ভারত শাসন পাকাপাকি ভাবে শুরু করে অনেকটা সেই সময় থেকেই বঙ্গসমাজে এই তথাকথিত 'ভদ্রলোক' নামে একটা শ্রেণীর সৃষ্টি হয় । বিদেশী শাসক শ্রেণীর আনুগত্যে একদল বঙ্গ সন্তান চাকুরি বা ব্যবসার দৌলতে অর্থোপার্জন করলে নিজেদের মধ্যে তারা একটা সমাজ তৈরি করে আর একরকমের অলিখিত সামাজিক নিয়ম কানুন বা বিধি নিষেধ চালু করেন । এর সিংহভাগই ছিল সাহেবদের ব্যবহারিক অনুকরণ । অর্থাৎ ভদ্র সমাজের নিয়মকানুন বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা গেল ইংরিজি etiquette শব্দের বঙ্গানুবাদ । এই সমাজভুক্ত কোন মানুষ আচরণ বিধি লঙ্ঘন করলে তাকে অভদ্র তকমা দিয়ে দেওয়া হত । কিন্তু যে সমস্ত মানুষ এই সমাজে আর্থিক বা সামাজিক মাপকাঠিতে ভদ্রলোক গোষ্ঠীতে জায়গা পেল না তাদের ছোটলোক পঙক্তিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হত । আজ একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছিয়েও সেই সামাজিক ধারা একটু আধটু পালটিয়ে প্রায় এক রকমই রয়ে গেছে । পরবর্তী সময়ে উচ্চবিত্ত সমাজে স্থান না পেয়ে স্বল্পবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষেরা নিজেদের মত করে মধ্যবিত্ত সমাজ সৃষ্টি করে । এদের সবাইকে নিয়েই ভদ্রলোক বাঙ্গালী সমাজের সৃষ্টি ।

প্রথম দিকে পেশাগত ভাবে এই ভদ্রলোক বাঙ্গালী সমাজের বেশিরভাগ ছিল ব্যারিস্টার, ডাক্তার, সফল ব্যবসায়ী ও ধনী পিতার বেকার সন্তান যারা পরিচিত হতেন ল্যান্ডলর্ড হিসেবে । চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট বা ইঞ্জিনিয়ারদের পেশা এই সমাজে তখনও পর্যন্ত 'ভদ্র' পেশা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে নি । ওদের বলা হত 'য়্যাকচুয়ারি' যেটি পরবর্তী সময়ে একটা বিশেষ পেশা হিসেবে গণ্য হয়েছে । এই শ্রেণীর ভদ্রলোকদের মিলিত হবার জায়গা বেশিরভাগ সময়ে হত কোন ক্লাবে বা সেই শ্রেণীর ধনী কোন বাড়ির মালিকের বসার ঘরে ঝাড় লণ্ঠনের আলোর নীচে । জমায়েতের একটা বিশেষত্ব ছিল যে পুরুষ ও মহিলারা সব সময়ে আলাদা আলাদা ঘরে মিলিত হতেন । কথোপকথনের যে কোন নির্দিষ্ট বিষয় থাকতে হবে তারও কোন ধরা বাঁধা নিয়ম ছিল না । এইসব জমায়েতে লক্ষ্ণৌ ঘরানার নাচ বা গান থেকে ফ্লুরি বা ফারপোর সাম্প্রতিকতম পেস্ট্রি বা ইটালিয়ান স্যুপ অথবা ফ্রেঞ্চ-ওয়াইন ও স্কচ-হুইস্কির চুলচেরা বিশ্লেষণ, কিছুই বাদ যেত না । লক্ষ্য করার বিষয় ছিল যে এঁরা কিন্তু কখনও উচ্চগ্রামে কথা বলতেন না আর কোন বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করতেন না । এই প্রথা প্রধানত পুরুষ মহলেই সীমাবদ্ধ থাকত । কোন বিষয়ে কোন নব্যাগত যদি ভুল করে মন্তব্য করে বসত তা হলে অবধারিত উত্তর হত 'ওহ রিয়েলি?' এমনকি আবহাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা হলেও 'গুমোট গরম বা প্যাচপ্যাচে বৃষ্টি' জাতীয় মন্তব্য নিছক অসভ্যতা হিসেবে বিবেচিত হত । বয়স্ক কোন প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক কিঞ্চিত মদ্যপানের পরে স্বগতোক্তির ঢঙে নিবে যাওয়া পাইপ মুখে কি বলে চলেছেন কেউ কিছু না বুঝলেও উনি যখন প্রতিটি বাক্যের শেষে 'ইজন্ট ইট' বলছেন তখন বাকী শ্রোতারা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ভদ্রতা প্রকাশ করতেন । এই সব বাঙ্গালী ভদ্রলোক মাঝেসাঝে রবি বাবুর গান বাঁধা নিয়ে আলোচনা করতেন কারণ রবি বাবু একটা নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন । বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ বা আনন্দমঠ যদি কেউ ভুল করে উল্লেখ করে ফেলতেন তা হলে অবধারিত একটা নির্বিষ মন্তব্য হত 'আনফেয়ার' ।

এইসব বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা কিন্তু সুচিন্তিত ভাবে দেশীয় রাজনীতি কখনই আলোচনা করতেন না । তবে ব্রিটেনে লেবার পার্টির বাড়বাড়ন্ত নিয়ে নিরামিষ আলোচনায় অবশ্য কোন বাধা থাকত না । এই সমাজে নারী সমাজের অধিকার ইত্যাদি 'সামান্য' বিষয় নিয়ে কেউ কখনও মাথা ঘামাতেন না । পারিবারিক ব্যবস্থায় নারী সমাজের ব্যয় করার সীমিত অধিকার থাকলেও আয় করার ব্যাপারে ছিল সীমাহীন বাধা । সভা ভঙ্গের পরে স্বামী সঙ্গিনী হয়ে গাড়িতে উঠে অন্য কোন ভদ্রলোক বা তাঁর স্ত্রীকে নিন্দাসূচক বাক্যে ভূষিত করার সময় মনে রাখতেন না যে গাড়িটির চালক বধির নয় । এই চালক গোষ্ঠীর মাধ্যমে এই সব নিন্দাসূচক অভিব্যক্তি কখনও কখনও ভদ্রলোকেদের সমাজে অশান্তির কারণ হয়েছে বলে শোনা যায় ।

এই তথাকথিত উচ্চবিত্ত ভদ্রলোক বাঙ্গালীদের নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিছু প্রাথমিক শর্ত পালন করতে হত । যেমন গৃহস্থালির আসবাব থেকে শুরু করে পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, যানবাহন, কথোপকথন ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রকমের আদব কায়দার অভ্যাস । কর্মক্ষেত্রে অথবা তার বাইরে সুচিন্তিত ভাবে সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচন ছিল নিজেকে ভদ্রসমাজে প্রতিষ্ঠিত করার কয়েকটি মুল শর্ত । এক একটি বিষয় পর্যালোচনা করলে আরও পরিষ্কার করে বোঝা যাবে ব্যাপারটা সমাজের মূল পর্যন্ত কেমন ভাবে ঢুকে গিয়েছিল ।

শোবার ঘরের খাট থেকে বসার ঘরের সোফা বা জানলার পর্দা কোন দোকানের কোন কারিগরের হাতে তৈরি অথবা বারান্দার রেলিঙ বা জানলার গরাদ কোন জাহাজে ইংলন্ড থেকে এসেছিল ভদ্রসমাজের আলোচনায় হাল্কা ভাবে ভাসিয়ে দেওয়া ছিল একটি অবশ্য কর্তব্য । পার্ক স্ট্রীটের বিশেষ দোকান থেকে স্যুট না বানালে বা চিতপুরের বিশেষ কারিগরের হাতে ফিনলে কোম্পানির ফিনফিনে কাপড়ের আদ্দির পাঞ্জাবী না বানালে গৃহকর্ত্রী কতটা রুষ্ট হন সেটিও সমাজের অন্য মানুষদের জানা না থাকলে সম্মানহানি হবার আশঙ্কা থেকে যেত । এই সব সামাজিক আলোচনায় জামাকাপড় ছাড়া মাথায় মাখা তেল-শ্যাম্পু, গায়ে মাখার সাবান-পাউডার-সুগন্ধি-আতর ইত্যাদি সগৌরবে ঘোষণা না করলে সামাজিক প্রেস্টিজ হানির আশঙ্কা ছিল ।

এর পরে আসত হেঁসেলের ইতিবৃত্তান্ত । সে যুগে রন্ধন প্রক্রিয়ায় জ্বালানী হিসেবে কয়লার কোন বিকল্প ছিল না । প্রতিটি বাড়ীর এক তলায় দুটি জিনিস অত্যাবশ্যকীয় ছিল । প্রথমটি চৌবাচ্চা আর দ্বিতীয়টি হল কয়লার ঘর । একতলায় একটি ঘর নির্দিষ্ট থাকত গেস্ট রুম হিসেবে । সাধারণত গরীব আত্মীয় কেউ এসে পড়লে তাঁদের স্থান হত এই ঘরটিতে । তাদের স্নান-খাওয়া ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় কর্ম এই ঘরেই সারতে হত । কখনও সখনও গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে এইসব গরীব আত্মীয়দের সঙ্গে দোতলার বারান্দায় গৃহকর্ত্রী কিছু পারিবারিক আলোচনা সেরে নিতেন । গৃহ কর্মে নিযুক্ত মানুষদের ঝি-চাকর হিসেবেই সম্বোধন করা হত । আজকালকার মত কাজের মাসী বা কাজের লোক বলার রেওয়াজ তখনও আসে নি । ডাল-ভাত-চচ্চরি জাতীয় খাবারের গল্প কোন মতেই এই সব উচ্চ সমাজে আলোচিত হত না । সাহেবরা কোন কিছু চর্বণ করে মুখ থেকে বের করে আনাকে অসভ্যতা মনে করত । বেচারা এই ভদ্রলোকেদের এই কারণে সজনে ডাঁটা থেকে মুরগির ঠ্যাং বা পাঁঠার হাড় চিবনো থেকে বঞ্চিত থাকতে হত । কেউ যদি ভুলক্রমে একটু শব্দ করে হাড়ের টুকরো আওয়াজ করে চিবিয়েছে তার কপালে ছিল অসীম দুর্ভোগ । পাশ থেকে কারুর মন্তব্য আসত 'আর ইউ রানিং এ ওয়ার্কশপ ইন ইয়োর মাউথ?' একবার তো ব্যানারজি পদবীধারী কারখানার এক বড় 'সাহেব' একজন জুনিয়র অফিসারের চাকরী প্রায় খেয়ে ফেলে ছিলেন । বেচারা জুনিয়র অফিসারটি কোম্পানির লাঞ্চ মিটিঙে সর্বসমক্ষে ফর্ক উল্টো করে প্লেট থেকে কড়াইশুঁটি মুখে দিয়েছিল । মুখ বেঁকিয়ে বড় সাহেব ওকে ধমকে বলে ছিলেন 'ওহে ওটা ফর্ক, বেলচা নয়' । অল্প বয়সী অফিসারটি তখনও পুরোমাত্রায় বাঙালী ভদ্রলোক হয়ে উঠতে পারেনি । চাকরীর খাতিরে মুখ নিচু করে প্লেটে পড়ে থাকা না খাওয়া কড়াইশুঁটি গুলোর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে নিশ্চয় নিজের অদৃষ্টকে গাল দিয়েছিল ।

এই সমাজে আরেকটি অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার ছিল সেটি হল বাড়ীর ঠিকানা । অর্থাৎ ড্রেসের সঙ্গে অ্যাড্রেসও সমাজে স্তর বিভাগের একটা জরুরী মাপকাঠি হত । জাতে উঠতে হলে কোন পাড়ায় কোন রাস্তায় বাড়ীর অবস্থান স্বগর্বে ঘোষণা করতে হত । উঁচু জাতের ভদ্রলোক সমাজে পাত্তা

পেতে হলে ছিদাম মুদি লেন জাতীয় গলি বা তস্য গলিতে ঠিকানা হওয়া চলত না । চাকুরে বা ব্যবসায়ী ভদ্রলোকদের আরেকটি জরুরী ব্যাপার ছিল কোন অভিজাত ক্লাবের সদস্য হওয়া । বহু অর্থের আর তোষামোদের বিনিময়ে এইসব ক্লাবের সদস্যপদ লাভ হলে সমাজে আরেক ধাপ উঁচুতে ওঠা যেত । এইসব ক্লাবের পুরুষ তান্ত্রিক আবহাওয়ায় চূড়ান্ত লিঙ্গ বৈষম্য ছিল বলে মেয়েদের ব্যক্তিগত সদস্যপদ দেওয়ার চল ছিল না । তবে নিউ ইয়ার্সের পার্টি বা অন্যান্য বিলিতি উৎসব পালনে স্বামী সঙ্গিনী হওয়াতে বাধা ছিল না । তারা তখন মিসেস অমুকের চেয়ে মিসেস তমুকের পোশাক বা গয়নার তুল্যমূল্য বিচারে প্রচুর সময় ব্যয় করতেন । এই নারী সমাজে উচ্চপদস্থ স্বামীর কর্মস্থলকে এঁরা সর্বদাই ‘আমাদের কোম্পানি’ বলে উল্লেখ করতেন । সময় সময় বিভিন্ন কোম্পানির দেওয়া বেতন বা অন্যান্য সুবিধার বিষয়ের তুলনামূলক বিচারও এই আলোচনায় বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠত । কার স্বামী দেবতার অফিসের সুন্দরী সেক্রেটারির প্রতি কতটা অনীহা সেটাও অনেক সময় প্রতিযোগিতামূলক আলোচনায় পর্যবসিত হয়ে উঠত । উচ্চবিত্ত সমাজে যাতায়াতের জন্য ব্যক্তিগত গাড়ি ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না । গাড়ি বলতে সবই ছিল ব্রিটেন বা আমেরিকায় তৈরি । ইটালিয়ান বা জার্মান গাড়ির সংখ্যা অল্প হলেও ছিল । বাবুদের থেকে এই গাড়ি নিয়ে চর্চা অন্দরমহলে বেশী হত । কার সনাতন নামের পুরনো ড্রাইভার নতুন কেনা ফ্লুইড ড্রাইভ ডজ্ গাড়ির ক্লাচে বেশী সময়ের জন্য পা রেখে গাড়ির সর্বনাশ করছে তাঁর বিস্তারিত বিবরণ শোনা যেত ক্লাবের এই জমায়েতে । ওই বিশেষ ‘ভদ্র’মহিলার বড় মেয়ের কলেজের বন্ধুরা কলেজ ফেরত আসার সময়ে ব্যাপারটি লক্ষ্য করে সনাতনকে ছাড়িয়ে দেওয়ার সুপারিশ করেছে । মেয়ের ঠাকুরমার চাপে সনাতন এ যাত্রা চাকরী রক্ষা করতে পেরেছে কারণ সনাতন ছাড়া ঠাকুমার বিশেষ দোকানের পান-জরদা-আফিঙের খবর বাড়ীর আর কেউ রাখত না ।

আজকের যুগের অল্পবয়সীদের এই ভদ্র সমাজের চেহারার খানিকটা আন্দাজ পাবার শ্রেষ্ঠ উপায় হল পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের কিছু বাংলা সিনেমা দেখে নেওয়া । এই সব সিনেমায় সচ্চরিত্র গরীব নায়কের বড়লোক প্রেমিকার বাবাদের বাড়ীর ভেতরের দৃশ্যে অতি অবশ্যই ড্রেসিং গাউন পরানো হত । ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, বিকাশ রায়েদের মাপের ড্রেসিং গাউন স্টুডিওর মেকআপ রুমে সব সময় মজুত থাকত । ওদের সব সময় দেখা যেত ছ’সিলিন্ডারের বড় গাড়িতে ঘোরাফেরা করতে । খাবার ঘরে খাবার পরিবেশনকারী টুপি মাথায় বেয়ারারা হাজির থাকত মালিকের বা ছায়া দেবীর মত মালকিনদের হুকুম তামিল করার জন্য । ফুলদানি সাজানো টেবিল ক্লথ ঢাকা ডাইনিং টেবিলে বিলিতি কাঁচের বাসন শোভা পেত । বসার ঘরের এক পাশে একটা পিয়ানো বা অরগ্যান রাখাও আবশ্যিক ছিল । বাড়ীর সদরে গাড়ি বারাণ্ডার নীচে গাড়ি এসে দাঁড়ালে ড্রাইভার বা দারোয়ান দৌড়ে এসে দরজা খুলে দিত মালিক-মালকিনিকে গাড়ি থেকে নামার জন্য । ভুল করেও মালিকরা নিজের হাতে গাড়ীর দরজা খুলে নামতেন না । একেবারে শেষ দৃশ্যের আগে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নায়কের এই বাড়িতে প্রবেশাধিকার সাধারণত থাকত না ।

এই সমাজের সদস্যরা গুটিপোকার মত নিজেদের তৈরি আবরণের মধ্যেই নিজেদের গতিবিধি সীমিত রাখত । নিম্নবর্গের মানুষেরা এঁদেরকে সমীহ করে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলত । চলার রাস্তায় কোন কারণে দেখতে পেলে এঁদের জন্য রাস্তা ছেড়ে দেওয়াই ছিল রীতি ।

সময়ের সঙ্গে সব কিছুর সঙ্গে সমাজেরও বদল অবশ্যম্ভাবী । বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বাঙ্গালীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার শুরু হতেই সমাজে উচ্চবিত্তদের একছত্র শাসন ক্রমশ কমতে শুরু করে । ততদিনে রাশিয়ার বিপ্লব হয়ে গেছে । দু দুটো বিশ্ব যুদ্ধ দুনিয়ার অনেক হিসেব নিকেশ পাল্টে দিয়েছে । অফিস-কারখানায় দলবদ্ধ ভাবে মালিকদের সঙ্গে টাকা পয়সা আর কাজের সময় নিয়ে দর কষাকষি শুরু হয়েছে । এক তলার মধ্যবিত্ত ভাড়াটেরা আর দোতলার মালিকদের সব আবদার বিনা প্রতিবাদে মানতে রাজী হচ্ছিল না । ইতিমধ্যে সাদা চামড়ার কারখানার মালিকরা একে একে দেশ ছাড়তে শুরু করেছে স্থানীয় মানুষদের হাতে মালিকানা ছেড়ে দিয়ে । একদল ছোকরা না কামান দাড়ি নিয়ে অফিস কাছারিতে যাওয়া শুরু করেছে । এক কথায় ইংরেজ আমলের এইসব তথাকথিত ভদ্র লোকেদের সামাজিক অবস্থানও ক্রমশ বদলাতে শুরু করেছে । সামাজিক নিয়ম কানুনও দেখতে দেখতে নতুন করে লেখা শুরু হয়েছে । মিলের ধুতির ওপর হাতা গোটান শার্ট ছেড়ে কেরানিকুল সুতির প্যান্ট আর হাফ হাতা জামা ঝুলিয়ে অফিস-কাছারিতে যাতায়াত করা শুরু করল । আর্থিক প্রয়োজনে ভদ্র বাড়ীর অনেক মেয়েরা কলেজ থেকে বেরিয়ে অফিসের দরজার কড়া নাড়া শুরু করল । সৃষ্টি হল একটা নতুন ভদ্রলোক বাঙালী সমাজের যার নিয়ম কানুন আগাগোড়া পাল্টে গেল ।

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত জগতে এর প্রভাব পড়তে সময় লাগে নি । চাঁদ-ফুল-আকাশ ছাড়া অন্য অনেক শব্দ অভিধান থেকে নেমে আসতে শুরু করল কবিতা আর গানের লাইনে । ক্রমশ এইসব ‘আধা-ইংরেজ’ বাঙালী ভদ্রলোকেরা চলে গেলেন ইতিহাসের পাতায় । ■

দুটি পান্থশালা

(আলফঁস দোদে-র ফরাসিতে লেখা ‘Les deux auberges’ গল্প থেকে সরাসরি বাংলায় অনূদিত)

- অনুবাদক : চন্দন আঢ্য

জুলাই মাসের দুপুর-গড়িয়ে যাওয়া এক বিকেল । ফিরছি নিম শহর থেকে । রাস্তায় একেবারে পিষে দেওয়ার মতো গরম । সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর চোখে পড়ে সূর্যের তাপে ঝলসে যাওয়া সাদা রাস্তা । ওলিভ বাগান আর ছোটো ছোটো ওক গাছের মধ্যের এই রাস্তাটি একেবারে ধুলোয় ঢাকা । মাথার উপরের আকাশ তামাটে সূর্যের আলোতে পূর্ণ । কোথাও ছায়ার চিহ্নমাত্র নেই । এক দমক হাওয়াও বইছে না । থাকার মধ্যে রয়েছে কেবল গরম হাওয়ার কম্পন আর ঘুরঘুরে পোকার কানে তালা ধরিয়ে দেওয়ার মতো উগ্র সুরেলা ডাক । এই ডাক সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে যাচ্ছিল প্রবল উজ্জ্বল আলোর অনুরণনের সঙ্গে । এইরকম সময়ে আমি টানা দু-ঘণ্টা হেঁটে যাচ্ছিলাম একেবারে এক ধুলোভূমির মধ্যে দিয়ে । হঠাৎ করে রাস্তার সেই ধুলোর চাদর সরিয়ে আমার নজরে এসে পড়লো কয়েকটি সাদা রঙের বাড়ি । বাড়িগুলোকে লোকেরা স্যাঁ-ভ্যাঁস বলে ডাকে । বাড়িগুলোর লাল ছাদের মাথায় আছে লম্বা লম্বা গোলাঘর,পাশে রয়েছে জল-শুকিয়ে-যাওয়া একটি নালা । নালার মধ্যে সরু সরু কিছু ডুমুর গাছ । গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে রাস্তার দু-পাশে একে-অপরের দিকে মুখ করে রয়েছে দুটো বড়ো সরাইখানা ।

এই দুই সরাইখানার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই কিছু কিছু চিত্তাকর্ষক দিক রয়েছে । রাস্তার এক দিকে রয়েছে প্রাণোচ্ছলতায় পূর্ণ একটি বড়ো নতুন বাড়ি । বাড়িটির সমস্ত দরজা হাট করে খোলা । ভিতরে রয়েছে বেশ সাজানো-গাছানো কয়েকটি ঘোড়ার গাড়ি । ঘাড় থেকে জোয়ালগুলো খুলে দেওয়ায় ঘোড়াগুলোর মুখ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে । যে-সব পান্থ তাড়াতাড়ি করে মদ্যপান করতে করতে রাস্তায় নেমেছিল, তারা দেওয়ালের গায়ে নুয়ে থাকা অল্প ছায়াতেই আশ্রয় নিচ্ছিল । বাড়িটির উঠোনে ঠাসাঠাসি করে ছিল প্রচুর খচ্চর আর ঘোড়ার গাড়ি । গাড়োয়ানরা সবাই বাড়ির বাইরের চালার নীচে ঠান্ডার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল । আর বাড়িটির ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছিল লোকজনের হই-হট্টগোল, চিৎকারের আওয়াজ, মুষ্টিবদ্ধ হাতের টেবিলের ওপর চাপর মারার শব্দ, গ্লাসের ঠুংঠাং, বিলিয়ার্ড বল মারার শব্দ, সোডা লিমনেড বোতলের ছিপি খোলার আওয়াজ । কিন্তু এই সমস্ত কলরবকে ছাপিয়ে গিয়েছিল একটি আনন্দমাখা কণ্ঠস্বর । লোকটির কণ্ঠের জোরালো আওয়াজ জানলার শার্সিকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছিল :

সুন্দরী মারগোতঁ
সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই
নিয়েছে নিজের তামার কলসিটি
জল ভরার জন্য বেরিয়ে পড়েছে ।

রাস্তার উলটোদিকের সরাইখানার ছবি প্রথমটির ঠিক উলটো । সেটি একেবারে চুপচাপ,পরিত্যক্ত । বাড়িটির প্রবেশপথের নীচেই ঘাস জমে আছে,কপাটগুলো গেছে ভেঙে । জং ধরা দরজার উপরে শিরস্ত্রাণের উপরে ব্যবহৃত পাখির পালকের মতো ঝুলছে সবুজ রঙের গুল্মজাতীয় গাছের ডাল । রাস্তা থেকে পাথর নিয়ে এসে ঘরের চৌকাঠকে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে । সবকিছুর মধ্যেই এমন দীনতা ও কারুণ্যের ভাব যে সেখানে বসে এক চুমুক পানীয় নেওয়াই যেন একরকমের বদান্যতা ।

সরাইখানাটিতে ঢুকেই আমি দেখতে পেলাম একটি বিশাল ঘর । ঘরটি একেবারে জনশূন্য এবং বিষণ্ণ । এই আলো-ঝলসানো দিনে পর্দাবিহীন তিনটি বড়ো বড়ো জানলা দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকে ঘরটিকে আরও পরিত্যক্ত, জনহীন ও বিষণ্ণ করে তুলেছে । ঘরের মধ্যে রয়েছে নড়বড়ে টেবিলের উপর ধুলোয় ঢাকা কয়েকটি অব্যবহৃত গ্লাস, একটি ভাঙাচোরা বিলিয়ার্ড টেবিল যার চারটি পকেট ভিক্ষাপাত্রের মতো ঝুলছে । এ ছাড়াও আছে একটি সবুজ পালঙ্ক, মদ্যপানের জন্য একটি পুরোনো বার । এই সমস্ত কিছুই যেন সেই প্রবল অস্বাস্থ্যকর গরমে একেবারে ঘুমিয়ে রয়েছে । থাকার মধ্যে আর আছে কেবল মাছি আর মাছি । এত মাছি জীবনে আমি কোথাও দেখিনি । ঘরের ছাদ থেকে শুরু করে জানলার কাঁচেতে বা গ্লাসের মধ্যে--সর্বত্রই একেবারে গুচ্ছ গুচ্ছ মাছি ঝাঁক বেঁধে রয়েছে । জানলা খোলামাত্রই আমি শুনতে পেলাম মাছির গুণ গুণ আওয়াজ,তাদের ডানা কাঁপানোর শব্দ । মনে হল ঘর নয়, আমি যেন একটা মৌচাকের ভেতর ঢুকেছি ।

ঘরের একেবারে পিছনের দিকে,জানলার শার্সির দিকে মুখ করে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একজন মহিলা । বাইরের পৃথিবীর দিকে একেবারে নিমগ্ন দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে । আমি তাঁকে দু-বার ডাকলাম :

“শুনছেন!”

গলার শব্দ শুনে তিনি ধীরে-সুস্থে আমার দিকে ফিরে তাকালেন । দেখতে পেলাম তাঁর কুঁকড়ে যাওয়া দেহের চামড়ার ভাজের দাগ আর মুখের মধ্যে ফুটে ওঠা বলিরেখার চিহ্ন । ভদ্রমহিলার গায়ের রং একেবারে মাটির মতো । লাল রঙের একটি জরির পোশাক পরে ছিলেন তিনি । তাঁর মুখের গঠন একেবারে কৃষকের মতো । পোশাক-আশাক আমাদের বাড়ির বৃদ্ধ মহিলাদের মতো । তিনি কিন্তু মোটেও বয়স্ক নন । চোখের জল শুকিয়ে গিয়ে তাঁকে আরও ম্লান, আরও বিবর্ণ করে দিয়েছে ।

“তুমি এখানে কী চাও?”--চোখের জল মুছতে মুছতে ভদ্রমহিলা আমার কাছে জানতে চাইলেন ।

--খালি একটু বসতে চাই আর কিছু একটা পান করতে চাই...

উত্তর শুনে ভদ্রমহিলা একেবারে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন । এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না । নিজের জায়গা ছেড়ে এক পা-ও না সরে তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন ।

“ এটা কি একটি সরাইখানা নয়?”

আমার এই প্রশ্ন শুনে ভদ্রমহিলা এবার একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালেন :

“নিশ্চয়ই...আপনি যদি মনে করেন তাহলে এটা নিশ্চয়ই একটি সরাইখানা...কিন্তু সবার মতো আপনিও কেন উলটোদিকের সরাইখানাটিতে গেলেন না? ওটা তো অনেক বেশি প্রাণবন্ত,অনেক বেশি জীবন্ত...” ।

--আমার কাছে ওই সরাইখানাটা প্রয়োজনের চেয়েও বেশি প্রাণবন্ত...তাই আপনার এখানে থাকতেই আমার বেশি ভালো লাগছে ।

এই কথা বলার পর,তাঁর উত্তরের জন্য আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে,আমি একটা টেবিলের সামনে বসে পড়লাম ।

ভদ্রমহিলা যখন নিশ্চিত হলেন যে সত্যি সত্যিই আমি তাঁর সরাইখানাতে থাকতে চাই,তারপর তাঁর কর্মব্যস্ততা শুরু হল । ঘরের মধ্যে এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা শুরু করলেন । কখনও ড্রয়ার খুললেন,কখনও বোতলগুলো নাড়াচাড়া করলেন,গ্লাসগুলোকে মুছলেন,আবার কখনও-বা মাছি তাড়ানোর কাজে ব্যস্ত থাকলেন...স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমার মতো ভ্রমণকারীর এখানে এসে পড়াটা বেশ একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কিছুক্ষণের জন্য সেই দুঃখী ভদ্রমহিলা নিজের মাথায় হাত দিয়ে এমনভাবে দাঁড়ালেন যে তিনি যেন পুরো ঘটনাটির পরিণাম দেখে নিতে চান ।

এরপর সেই ভদ্রমহিলা পিছনের দিকের ঘরে চলে গেলেন । টেবিলের সামনে বসে থেকেই আমি বড়ো বড়ো চাবি নাড়ানোর আওয়াজ শুনতে পেলাম । তালা ঝাঁকানোর আওয়াজও কানে এল । বুঝলাম পাউরুটি রাখার বাক্সটিকে তিনি বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন । এরপর তাঁর ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলার শব্দ পাওয়া গেল । তারপর তিনি ধুলো ঝাড়লেন,প্লেটগুলোকে ধুলেন । মাঝে-মধ্যে শোনা গেল গভীর দীর্ঘশ্বাস, সঙ্গে গলার মধ্যে আটকে থাকা ফোঁপানি ।

চারপাশের এইসব কাজ করতে তাঁর মিনিট পনেরো সময় লাগলো । এরপর তিনি আমার জন্য প্লেটে করে নিয়ে এলেন কিছু শুকনো কিসমিস, বেলেপাথরের মতো একটি পুরোনো শক্ত পাউরুটি এবং অত্যন্ত মাঝারি মানের এক বোতল ওয়াইন ।

“এগুলি সব আপনার জন্য”--এই কথা বলে সেই অদ্ভুত স্বভাবের মহিলাটি আবার অত্যন্ত দ্রুত আগের মতো সেই জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ।

পান করতে করতে আমি তাঁর সঙ্গে গল্প জমাতে চাইলাম । চাইলাম তাঁকে দিয়েও কিছু কথা বলাতে ।

“আপনার এখানে বোধহয় সবসময় বেশি লোক আসে না, তাই না ম্যাডাম?”

--ওহ!! কখনোই কোনো লোক আসে না...এই অঞ্চলে আমরা যখন একমাত্র পান্থশালা ছিলাম,তখন অবশ্য অবস্থাটা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল । স্কোটার পাখি শিকারের মরশুমে আমরা দুপুরবেলার খাবার তৈরি করতাম, এ ছাড়াও সারা বছরের জন্য থাকত গাড়ির ব্যবস্থা...কিন্তু যেদিন থেকে এখানে আরও কয়েকটি সরাইখানা তৈরি হল, সেইদিন থেকে আমরা সব কিছু হারিয়ে ফেললাম । সমস্ত লোকই সামনের সরাইখানাতে যেতে পছন্দ করলো । আর আমাদেরটা গভীর দুঃখে ছেয়ে গেল...আমাদের সরাইখানাটি কারোর কাছেই আর আরামের মনে হল না । তা ছাড়া আমি সুন্দরীও নই । প্রায়ই জ্বর-জ্বালা লেগে থাকত । আমার দুটি ছোটো মেয়েও মারা গেছে ইতিমধ্যে...অথচ উলটোদিকের সরাইখানাটির ছবি একেবারে এর উলটো । সেখানে সবাই সারাক্ষণ খালি হেসেই চলেছে । একজন আর্লেসীয় সুন্দরী মেয়ে ওই সরাইখানার প্রাণভ্রোমরা । তিনি জরি দেওয়া পোশাক পরেন । গলায় রয়েছে তিনটি সোনার চেন । তাঁর কন্ডাকটর প্রেমিকটি তাঁর জন্য গাড়ির মধ্যে অনেক খরিদ্দার নিয়ে আসে । এ ছাড়াও তাঁর আছে অনেক সুন্দরী পরিচারিকা,যারা মিষ্টি কথায় মানুষকে ভুলিয়ে প্রলুব্ধ করতে পারে । এইজন্যই তাঁর ব্যাবসা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে । বোজুস, রোদেসঁ, জঁকিয়ে--এইসব জায়গার যুবকরা উলটোদিকের সরাইখানাতেই তাই ভিড় জমায় । ঘোড়ার গাড়ির চালকেরাও ওই পান্থশালার চারপাশেই কেবল গাড়ি নিয়ে ঘুর ঘুর করে...আর আমি,আমি এখানে প্রত্যেকদিন একা বসে থাকি, কোনো পথিক এখানে আসে না,শূন্যতার মধ্যে একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছি ।

এই সমস্ত কথাই তিনি বলেছিলেন জানলার কাচে কপাল ঠেকিয়ে অত্যন্ত উদাসীনভাবে । তাঁর গলার স্বরে ছিল এক রাশ ক্লেশ । সেই সময় উলটোদিকের সরাইখানায় এমন কিছু একটা ঘটলো যেটা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো...

হঠাৎ করে,রাস্তার ঠিক উলটো দিকে বেশ বড়োসড়ো একটা কর্মকাণ্ড শুরু হল । একটি ঘোড়ার গাড়ি ধুলোর মধ্যে দিয়ে এগোতে শুরু করলো । ঘোড়ার পিঠে কশাঘাতের শব্দও শোনা গেল, শোনা গেল ঘোড়ার গাড়ির চালকের শিঙা বাজানোর আওয়াজও । সেই সময় একদল মেয়ে তাড়াতাড়ি করে দরজার কাছে এসে বেশ জোর গলায় চিৎকার করে বলে উঠল :

"বিদায়!...বিদায়!..." ।

কিন্তু এই সবকিছু ছাপিয়ে গেল একটি সুন্দর কণ্ঠের গান :

নিজের সুন্দর তামার কলসিটি নিয়ে
নদীতে গেছে সে জল ভরতে :
কিন্তু সেখানে সে দেখতে পায়নি
তিনজন নাইট সেনা আসছে...

এই সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শোনার পরেই ভদ্রমহিলার সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল । আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন :

"তুমি কি এই কণ্ঠস্বরটি শুনতে পেলে । যাঁর গলা তুমি শুনলে, তিনি হচ্ছেন আমার স্বামী...তাঁর গলার স্বর সত্যিই কি সুন্দর নয়?"

এই শুনে আমি অবাক ও স্তম্ভিত হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম ।

"কী!! তোমার স্বামী? এমনকি তিনিও ওই উলটোদিকের সরাইখানাতেই গেছেন?"

এরপর সেই অতিথিসেবিকা ভদ্রমহিলা অত্যন্ত কোমল স্বরে ভগ্ন হৃদয়ে বললেন :

"আপনি আর কী করবেন বলুন? সব ছেলে এইরকমই হয় । কাউকে কাঁদতে দেখতে তারা মোটেই পছন্দ করে না । আর আমি,আমি আমার দুই মেয়ের মৃত্যুর পর থেকে কেবল কেঁদেই চলেছি । ফলে আমার এই ঘরটি সবসময় এত দুঃখে পরিপূর্ণ যে কেউ এখানে খেতেই আসে না । আর আমার বেচারা স্বামীও যখন যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে যান,তখনই তিনি সামনের সরাইখানায় গিয়ে মদ্যপান করে আসেন । আর ওঁর গলার স্বর যেহেতু অত্যন্ত সুন্দর,তাই ওই আর্লেসীয় মেয়েরা তাঁকে দিয়ে গান গাওয়ায় । চুপ!...দেখো আবার উনি গান শুরু করলেন । "

আবার তিনি শিহরিত হলেন । বড়ো বড়ো অশ্রুফোটায় তখন তাঁকে আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে । জানলার সামনে কেমন যেন এক ভাবাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে, হাত বাড়িয়ে স্বামীর প্রতি ইঙ্গিত করে, তিনি আর্লেসীয় মেয়েদের উদ্দেশে গাওয়া তাঁর স্বামী জোসের গান শুনছিলেন :

প্রথম মেয়েটিকে উদ্দেশ করে তাঁর স্বামী বললেন :

"সুপ্রভাত,হে সুন্দরি!" ■

আলফঁস দোদে

অনন্ত প্রেম

- শুভা আঢ্য

হাইওয়ে থেকে নেমে, প্রথম ডান দিকে ঘুরেই চোখে পড়ে সুদৃশ্য সাদা বাড়িটা, আকাশের পটে ভেসে থাকা বিশাল একটা মেঘের মতো I হাসপাতাল তো নয়, যেন পাঁচ তারা হোটেল। যান বহুল রাস্তার side walk পেরিয়ে, সবুজ লনের মাঝখানে, দুপাশে ফুলের পাড় দেওয়া, লাল টাইলের পায়ে চলার সরু পথ। অবশ্য ওটা শুধুই সাজানো পথ, এখানে সবাই গাড়িতে এসে হাসপাতালের পিছনে বহুতল পার্কিং লট এর ভেতর দিয়েই হাসপাতালে প্রবেশ করে। একতলায় ঢুকেই বিশাল অর্ধ চন্দ্রাকৃতি লবি। পায়ের নিচে মসৃন মোজেকের ওপর কালো মার্বেলের মোটা থাম গুলোর আশেপাশে, গোল টেবিলের চারপাশে সাজানো মেরুন চামড়ার সোফা, আর চেয়ার। এক দিকের দেওয়াল জুড়ে রঙিন মাছ ভর্তি aquarium আর অন্য দিকে এক ঝকঝকে কালো, বেবি গ্রান্ড পিয়ানো I ওটা বাজাবার জন্যে এক স্থানীয় শিল্পীগোষ্টির ভলান্টিয়াররা পালা করে আসেন তাই সব সময়েই মনোরম সুরের মৃদু ঝঙ্কারে লবিটি পরিপূর্ন হয়ে থাকে। এই মনোহরণ পরিবেশের আড়ালে যে সারাক্ষন জীবন মৃত্যু, নিয়ে যুদ্ধ চলেছে অবিরাম তার খবর আছে শুধু এখানে সেই সব মানুষ গুলির কাছে, যারা নিজেরা অথবা কোনো প্রিয়জনের জন্য এই হাসপাতালের শরণ নিয়েছেন, নানা কারণে।

Lobby র একেবারে পিছন দিকে চারটি elevator নিঃশব্দে ওঠা নামা করছে। Elevator গুলোর পাশে একটি Reception desk ও চেক-ইন কাউন্টার I ওপরে যেতে গেলে ইলেকট্রনিক কার্ড লাগে, অবাঞ্ছিত অতিথিদের গতিবিধির ওপর নজর রাখার উদ্দেশ্যে। এইমাত্র চার নম্বর elevator টি কয়েকটি ফ্লোর অতিক্রম করে, এসে, থামলো Oncology Floor এর সামনে। টুং টুং শব্দে দরজা খুলে গেলে, Elevator থেকে সাদা কোট পরা দু'জন ডাক্তার ও একদল নীল সার্জিক্যাল scrub পরা ইন্টার্ন ব্যস্ত সমস্ত পায়ে বেরিয়ে গেলে, তাদের পিছনে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ মানুষ। পরনে খাকি ট্রাউজার, সাদা শার্টের ওপর গাঢ় নীল ব্লেজার , হাতে একটি ছোট ছোট সাদা ফুলের গুচ্ছ। গত দু'দিন তিনি অন্য এক floor এ এসেছিলেন, তাই আজকের এই স্থান বদলে, একটু, চিন্তিত। এ ব্যাপারে নিচের রিসেপশনের মেয়েটি কিছু বলতে পারেনি, শুধু নতুন ঘরের নম্বর জানিয়েছিল। এখন তাঁর গন্তব্য, ১৮ নম্বর ঘর। সেখানে আছেন তাঁর স্ত্রী, মিসেস ডোনা ওয়াটসন। তিনি দিন দুয়েক আগে পিঠের ও পেটের অসম্ভব যন্ত্রনা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ছিলেন ও তাঁর ইমার্জেন্সি সার্জারি, করতে হয়েছিল। গল ব্লাডার এর সার্জারি সফল হয়েছিল বলেই শুনেছিলেন, তাহলে ডিসচার্জ করবার জায়গায় ঘর বদল কেন?

১৮ নম্বর ঘরে টোকা দিতে উত্তর এলো,-- ভিতরে এসো। বৃদ্ধকে দেখে বিছানায় বসা ডোনা হাসিমুখে আহ্বান করলেন --এসো, এসো, এখনই তোমার কথাই নীনা কে বলছিলাম। আমাদের ৬০ বছরের বিয়ের anniversary আর কটা দিন পরেই শুনে ও তো ভারী অবাক! Richard meet Dr. Nina Roy. She has been taking good care of me. নীনার দিকে ফিরে বললেন, Nina, this is my husband, Richard. নীনা স্মিত হেসে বৃদ্ধকে বললো, --Congratulations! 60 years together! আজকালকার দিনে এ তো বিরল ঘটনা। রিচার্ড ডোনার হাতে ফুলগুলি দিয়ে, আলতো হাতে তাঁর কপালে হাত বুলিয়ে বললেন, -- আমি আর ডোনা যে কখনো আলাদা ছিলাম মনেই পড়েনা, আর করতেও চাইনা ! তাঁর শেষের কথাগুলো শুনে নীনার মুখে যে উদ্বিগ্ন একটি ছায়া পড়লো সেটা ওঁরা দু'জনেই খেয়াল করলেন না I নীনা, অল্প দিনই এই ক্যান্সার ফ্লোর এ internship এর rotation শুরু করেছে I এই দুরারোগ্য রোগের ভয়াবহতাকে ভালো করে মেনে নিতে পারেনি এখনো। ও ডোনার চার্ট পড়ে জেনেছে, কি নিদারুন সংবাদ আজ অপেক্ষা করে আছে এই অশতিপর মানুষ দুটির জন্য I মন অস্থির হলেও, যতক্ষণ না Oncology Department এর ডঃ রেমন্ড নিজের মুখে পেশেন্ট ও পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন তার করার কিছুই নেই। নীনা, ডোনার সার্জিকাল অপারেশন এর ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে, মুখে হাসি টেনে এনে বললো, ঠিক আছে, ভালো ভাবেই সারছে। আরও জিজ্ঞেস করলো কোথাও কোনো ব্যথা বা অসুবিধে আছে কিনা I ডোনা ও রিচার্ড দু'জনের মুখেই স্বস্তির স্বাক্ষর। রিচার্ড বলে উঠলেন-- ও বাড়ি গেলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমি তো ভেবেছিলাম আজকেই ওকে নিয়ে যাবো। By the way, --তুমি কিছু জানো, এই floor এ ওর transfer হওয়ার কারণ? নীনা মনে মনে নিজের অসহায়তার সমুদ্রে ডুবে যাবার মুহূর্তেই, ঘরের দরজায় টোকা পড়লো। Xray department এর লোক I ডোনাকে যেতে হবে I ডোনা wheel chair এ বসে যাবার আগে রিচার্ড কে বলে গেলেন,---Guess we have to deal with these hospital formalities. --Well, stay put, ---will be back in a flash! ---That's my girl,--- সহাস্যে উত্তর দিলেন রিচার্ড I

রিচার্ড কে ঘরে রেখে ওয়ার্ডের মাঝখানের staff area তে বসে অস্থির চিন্তায় ডুবে গেলো নীনা I রিচার্ড আর ডোনা যে আধুনিক হাসপাতালের সঙ্গে পরিচিত নয় তা বোঝা কঠিন নয় I Surgery floor থেকে Oncology floor এ ট্রান্সফার হওয়ার তাৎপর্য যে কি হতে পারে তাও তাঁরা বুঝতে পারেননি I এরপর যখন Oncologist ডঃ রেমন্ড ওঁদের সার্জারি তে পাওয়া diagnosis শোনাবেন,----আর ভাবতে পারেনা নীনা I ওর হঠাৎ একটা অসম্ভব unscientific কথা মনে হলো I ও যদি কোনো দৈববলে গত তিনচার দিনের ঘটনা রিচার্ড আর ডোনার জীবন থেকে মুছে দিতে পারতো, পারতো ওঁদের ৬০ বছরের বিবাহ বার্ষিকীকে শুধুই আনন্দের একটি ঘটনায় বদলে দিতে, তাহলে পৃথিবীতে কার কোন ক্ষতি হতো?--- নীনা চমকে ওঠে , নার্স রবিন এর প্রশ্নে ---you okay? কি করছে সে? পেশেন্ট এর সঙ্গে প্রফেশনাল দূরত্ব রাখার প্রয়োজনীয়তা কোন ডাক্তার না জানে, সে এমন করে ভাবের স্রোতে ভেসে গেলো কেমন করে? নিজেকে ঝটিতি সামলে নিলো নীনা, নিয়ে রবিনকে বলল,--Oh yes, I am good, just waiting for the rounds to start.

একটুক্ষণ পরে দূর থেকে করিডোরের শেষ প্রান্তে ডঃ রেমন্ড আর তাঁর সঙ্গে আরো দুজন ডাক্তারকে এদিকে আসতে দেখে নীনা দ্রুত রওনা হলো ডোনার ঘরের দিকে I রিচার্ড বসে একটি ম্যাগাজিন দেখছিলেন | ডঃ রেমন্ড ও পিছনে নীনা ও আরো কয়েকজন কে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। রিচার্ড কে নিজের পরিচয় দিয়ে, ডঃ রেমন্ড নীনাকে জিজ্ঞেস করলেন,-- তোমার পেশেন্ট কোথায় ? Xray তে গেছেন শুনে রিচার্ড কে বললেন, ভেবেছিলাম আপনাদের দু' জনের সঙ্গে আগামী প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করবো কিন্তু,-- থাক, আমি নাহয় আবার ফিরে আসছি। রিচার্ড সামান্য উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে বললেন, কিন্তু আমার স্ত্রীর surgery তো ঠিকমতোই হয়েছে, তার তো এবার discharge

www.batj.org

হওয়ার কথা, তাহলে আর আলোচনা করবার কি আছে?--- আপনি, আমাকে বলুন, আমি জানতে চাই I দুঃসংবাদ শোনার মতো মনের জোর যে সবার থাকেনা তা নীনা এই ক্যান্সার ফ্লোর এ অল্পদিন কাজ করেই জেনেছে কিন্তু তার থেকেও বেশি করে সে উপলব্ধি করেছে যে দুঃসংবাদ দেবার ক্ষমতাও সবার থাকেনা৷ Oncology ডিপার্টমেন্ট এর প্রধান, ডঃ রেমন্ডের bed side manners বিখ্যাত I তাঁর সৌম্য শান্ত ব্যক্তিত্ব, দুরূহ পরিবেশকে, প্রত্যক্ষ কিন্তু সহজ করে ব্যাখ্যা করবার স্বাভাবিক প্রতিভার তুলনা বিরল I যদিও ডঃ রেমন্ড এর মুখ দেখে কিছু বোঝা গেলোনা, তবু তিনি যে এবার এক অতি কঠিন situation এর মুখোমুখি দাঁড়াবেন সেটা, সম্ভবত রিচার্ড ছাড়া ঘরে উপস্থিত সকলেই অনুমান করতে পারলো৷

ডঃ রেমন্ড, রিচার্ড কে বসতে বলে তার পাশের চেয়ারটিতে বসলেন৷ তারপর রিচার্ড এর চোখের দিকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন,--Mrs. Watson,এর gall bladder surgery successful হয়েছে সে কথা ঠিক, কিন্তু তার পরের যে test গুলি করা হয় তাতে আমরা জেনেছি Mrs. Watson এর gall bladderএ ক্যান্সার পাওয়া গেছে, আর খুবই advanced স্টেজ হওয়ার জন্য হয়তো শরীরের অন্য জায়গাতেও ছড়িয়ে গেছে৷ ডঃ রেমন্ড থামলেন৷ নীনা তাকিয়ে দেখলো, রিচার্ড এর মুখ একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেছে৷ চেয়ারের হাতলে রাখা শীর্ণ হাতদুটি একটু একটু কাঁপছে I ১৮ নম্বর ঘরের স্তব্ধতা যখন প্রায় অসহনীয় হয়ে উঠেছে, তখন রিচার্ড খুব আস্তে আস্তে বলে উঠলেন,-- how long does she have? ডঃ রেমন্ড একটু ঝুঁকে রিচার্ড এর হাত ধরে বললেন,--there is no easy way of saying this Mr. Watson. Looking at the things that we know now, ----from 4 to 6 months! I am really sorry!

---- রিচার্ড তখনও খানিকটা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন দেখে ডঃ রেমন্ড, নরম গলায় বললেন, --We will do everything to keep her comfortable. ডঃ রেমন্ড নীনাকে উদ্দেশ করে বললেন,---নীনা,আমি জানি তুমি তোমার পেশেন্ট ও ফ্যামিলীর কেয়ার এ কোনো ত্রূটি হতে দেবেনা৷ এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে, যাওয়ার সময়ে রিচার্ড এর হাতে একটু চাপ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন৷

ডঃ রেমন্ড ও অন্যান্যরা বেরিয়ে গেলে নীনা একরাশ অসহায়তা নিয়ে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো I রিচার্ড এর দিকে সে যেন চোখ তুলে তাকাতেও পারছিল না I এইতো ক'টা মিনিটই বা হবে, কিন্তু ওই দুটি মানুষের জীবনে কি মহা প্রলয় নিয়ে এলো, তোলপাড় করে, ভাসিয়ে নিয়ে গেলো সবকিছু৷ রিচার্ড মাথা নামিয়ে, নিষ্প্রাণ মূর্তির মতো বসে ছিলেন, মনে হচ্ছিলো যেন একটু ছোঁয়াতেই ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে যাবেন৷ নীনার মাথার মধ্যে ভাবনাগুলো তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল৷ সে ডাক্তার৷ তার এখন অনেক কাজ৷ রিচার্ড ও ডোনা কে যতটা সম্ভব সহজ করে ডোনার ক্যান্সার এর diagnosis ও prognosis বোঝাবার প্রয়াস করতে হবে । তাঁদের মানসিক অবস্থা পরিমাপ করে psychiatry ডিপার্টমেন্ট এর সঙ্গে consulting এর ব্যবস্থা করতে হবে । ডোনার বর্তমান অবস্থা ও আগামী দিনগুলোর disease progression এর ব্যাপারে Palliative care department এর সঙ্গে ডোনার কেস নিয়ে আলোচনার সূচনা করতে হবে । Palliative care department এর কাজ, ব্যাধির আরোগ্য যখন সম্ভব নয় তখন রোগীকে, Pain control, Supportive therapy ও Counseling এর মাধ্যমে যতদূর সম্ভব, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, যন্ত্রণা মুক্ত শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক সান্ত্বনা দেওয়ার ।

"নীনা"---রিচার্ড এর ডাকে নীনা চমকে উঠলো । কি করছিল সে? কি করে ভুলে গিয়েছিলো,--compassionate , competent professional care, তার সর্ব প্রথম দায়িত্ব ! মুহূর্তে তৎপর হয়ে উঠলো সে । রিচার্ডের কাছে গিয়ে তাঁর শীর্ণ দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, বলুন রিচার্ড, আমি কেমন করে আপনার সাহায্য করতে পারি । রিচার্ড তাঁর সজল চোখ দুটি তুলে, অশ্রুতপ্রায় কণ্ঠে বললেন, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে । ---তুমি তো দেখেছো, আমার ডোনা কত happy, আজ বাড়ি যাবে বলে । সে আরো খুশি, কারণ আগামী মাসে আমরা Paris যাবো আমাদের anniversary উদযাপন করতে । আমাদের সমস্ত জীবনের স্বপ্ন, আমরা একবার যাবো সেখানে,---to the eternal city of love! তুমি তার কাছ থেকে সে স্বপ্ন কেড়ে নিয়োনা ! তাকে বলোনা, আজ ডঃ রেমন্ড যা বলে গেলেন । ডোনার নরম মন এ সংবাদ নিতে পারবে না । ভেঙে যাবে । Please , please তুমি আমার এ কথা রেখো । এরপর তিনি স্খলিত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, নীনা কিছু বলবার আগেই ।

নীনার সামনে এক অসম্ভব পরিস্থিতি! Medical ethics ও হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী পেশেন্ট কে তার অসুস্থতার diagnosis, prognosis ও আগামী প্ল্যান খুলে বলতে হবেই । সে তো একজন intern মাত্র । ডঃ রেমন্ড যে decision নিয়েছেন তার ওপর অন্য কোনো decision নেওয়া তো দূরের কথা, সে নেবার permission ও তার নেই । দুশ্চিন্তার ভার নীনা একমাত্র তার সাথী intern দের কাছেই ব্যক্ত করতে পারে, কিন্তু তারাই বা কি পরামর্শ দেবে?

নীনার এই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থার মধ্যেই ডোনার গলা শোনা গেল দরজার ওদিকে, ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই wheel chair ঠেলে ঘরে ঢুকলো ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট এর লোকটি । ডোনা কে বিছানায় যত্ন করে বসিয়ে দিয়ে লোকটি চলে যাওয়া মাত্র নীনা কে কাছে ডেকে প্রশ্ন করলেন ডোনা, --- বলোতো নীনা, Oncology floor মানে তো ক্যান্সার floor, তাই না? নীনা উত্তর দেওয়ার আগেই ডোনা বললেন, দেখো আমি একটু সন্দেহ করেছিলাম আমার সার্জেরীতে কিছু ধরা পড়েছে, নাহলে এই ফ্লোরে আসতে হবে কেন? রিচার্ড ছিল বলে কিছু বলিনি । নীনা, এই অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলার শান্ত আবেগহীন ভাবে বর্তমান পরিস্থিতির interpretation করার ক্ষমতা দেখে একাধারে বিস্মিত ও চমৎকৃত না হয়ে পারলোনা । বললো, একটু আগে ডঃ রেমন্ড এসেছিলেন , তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য আবার আসবেন, আমি কি তাঁকে ডাকবার ---, ডোনা এই অবধি শুনে বললেন, তার চেয়ে তুমিই আমাকে বলো না কেন? ক্যান্সার তো বুঝতেই পারছি, কিন্তু ট্রিটমেন্ট করবার অবকাশ আছে? নীনা মনের সমস্ত শক্তি একত্র করে বললো, আপনাকে palliative treatment দেওয়ার ব্যবস্থা আছে আমাদের হাসপাতালে, যাতে ---নীনাকে থামিয়ে ডোনা বলেন, আমি জানি সে ট্রিটমেন্ট এর কথা । আমার এক নিকট বন্ধুকে আমি recently হারিয়েছি, এই অসুখেই । তারপর যোগ করলেন, শোনো নীনা, আমার একান্ত অনুরোধ তোমার কাছে, রিচার্ড কে এখন এ কথা জানবার প্রয়োজন নেই । তুমি তো দেখেছো ও কত খুশি আমাকে আজ বাড়ি নিয়ে যাবে! আর আমাদের Paris যাওয়ার প্লানের কথা তো বলিনি তোমাকে । আমরা নিশ্চয়ই যাবো সেই অনন্য City of love এ, দাঁড়াবো Eiffel tower এর নিচে । এ আমাদের বহু দিনের স্বপ্ন । আমাদের সে স্বপ্ন সফল করতে তোমার মতো মিষ্টি মেয়ে সাহায্য করবে না, তা তো হয়না, কি বলো ?

ঠিক এই সময়ে রিচার্ড ঘরে এলেন, হাতে একগুচ্ছ টুকটুকে লাল গোলাপ । ডোনা সহাস্যে বলে ওঠেন, রিচার্ড এসো এসো । সুন্দর ফুলগুলো আমাকে দাও আর নিচে গিয়ে, এদের হিসেব চুকিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করো, আমি তৈরী হয়ে আসছি । রিচার্ড একবার নীনার দিকে অবাক হয়ে তাকাতে, তিনি তাড়া দিলেন, যাও ডারলিং, আমি এলাম বলে । রিচার্ড চলে গেলে, একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, acting খারাপ করিনি মনে হয়, রিচার্ড আমাকে বিশ্বাস করেছে, তাই না? ওকে আমি দুঃখ দেবার কথা ভাবতেও পারিনা! এবার যাও তো তোমাদের ডিসচার্জ পেপার-টেপার নিয়ে এসো, আর যদি আর কারো পারমিশন নিতে হয় তাহলে বোলো আমি discharge চাইছি , against medical advice, তাহলে ব্যাপারটা সহজে হবে ।

নীনা, ডোনা কে রিচার্ড এর অপেক্ষারত গাড়িতে পোঁছে দিয়েছিলো সেদিন । রাতে নিজের দিনপঞ্জিকায় লিখেছিলো, --অনেক শেখার মাঝে আজকের এই দিনটি আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে । আজ আমি প্রত্যক্ষ করেছি এক অপরূপ কাহিনী । জেনেছি, প্রেম, দুটি মানুষকে শুধু কাছেই আনেনা, তাদের নতুন করে সৃষ্টি করে, সেখানে দু'জন এক হয়ে যায়, একই আনন্দে, একই সুখে, একই দুঃখে আর বেদনায় । প্রেম তাদের নিয়ে যায় এক অনন্য জগতে, আলো ছায়া, হাসি কান্না, সত্য মিথ্যা, সব কিছুকে অতিক্রম করে । সে অনন্ত প্রেমের স্বর্গে শুধু তাদেরই অধিকার ।।

সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১৭

নীনা, মা কে ফোন করে বলে,---- মা, আমাকে তোমার favorite poem, ----Eternal Love শোনাও, প্লিজ ! ,--

মা বলে চলেন ------

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার ।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার--
কত রূপ ধরে পরেছ গলায় , নিয়েছো সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার ।। ----

নীনা শান্ত হয়ে ঘুমোতে থাকে ।।

ভায়রা-ভাই

- গৌতম সরকার

একই সাথে কান ধরে বেঞ্চের উপর দাঁড়ানো, বা ক্লাশরুমের বাইরে নিল-ডাউন হবার পর স্কুলের বন্ধুরা যখন হয় ভায়রাভাই ধ্রুবর সাথে আলাপ সেই ৭০-এর দশকের শেষার্ধ থেকে, যখন আমরা একই সাথে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হলাম । স্কুলে যাতায়াত করতাম স্কুলের বাসে । বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে কয়েক পা হাঁটলেই গোলপার্ক, আর সেখান থেকেই স্কুলের বাসে ওঠা-নামা । ভোরবেলা তো মা ভালোয় ভালোয় বাসে উঠিয়ে দিতেন । কিন্তু ফেরার সময়? বাস থেকে যদি ঠিকঠাক না নামি, বা অন্য কোথাও ভুলভাল নেমে পড়ি, তাহলে? তাতেই মায়ের চিন্তার শেষ ছিল না । মা মোটেই রাজী ছিলেন না যে আমি এত দূরে স্কুলে যাই (আসলে কিন্তু হেঁটেই যাওয়া যায়!) । বাড়ির কাছেই তো জগবন্ধু (জগদ্বন্ধু), আর তা না হোলে আর দু পা এগোলেই পাঠভবন বা সাউথ-পয়েন্ট, তা হোলে? কিন্তু বাবা-কাকারা নাছোড়বান্দা । এই স্কুল থেকে নাকি প্রতি বছরই স্কুল-ফাইনালে 'স্ট্যান্ড' করে, কোনো কোনো বছর নাকি ফার্স্ট-সেকেন্ড-থার্ড সব একই সাথে! অগত্যা মায়ের বারণ ধোপে টিকল না ।

মা তাই রোজই পাখী পড়ানোর মতো করে আমাকে বলে দিতেন যে "স্কুল ফেরত ঐ যখন গোলপার্কের বিবেকানন্দের মাথা দেখতে পাবে, জানবে তখনই বাস থেকে নামতে হবে" । আমার কি ছাই আর অত মনে থাকে, যে কখন বিবেকানন্দের মাথা দেখতে হবে? কিন্তু হুসেইনদার (ড্রাইভার) বাসে আরও একজন থাকতেন, যার কাজই ছিল আমাদের ঠিকঠাক নামিয়ে দেওয়া । বয়সে হয়ত তিনি আমার বাবার চেয়েও বড়, কিন্তু সবাই তাঁকে বলত 'ধ্রুবদা' । ভোরবেলা মায়ের কথা তাই আর তেমন গায়ে মাখতাম না, জানতাম যে আমি ভুলে গেলেও ধ্রুবদা ঠিক নামিয়ে দেবেন! পরিত্রাতা ধ্রুবদা! এরই সাথে আর একটা জিনিস নজরে এল, আমাদের ক্লাসের ঐ কালো করে ছেলেটা; যে ঐ পার্ক সার্কাসের মাঠের দিকটায় স্কুলবাস থেকে নামে, ওর নামও তো ধ্রুব!

তারপর কোথা দিয়ে সময় চলে গেল । মর্নিং-সেকশন, 'মুনমুন সেন' পাড়ি দিয়ে আমরা পাড়ি জমালাম ডে-সেকশনে । বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে তত দিনে ধ্রুবর সাথে! একবার একটা কথা শুনে কেমন যেন অদ্ভুত মনে হোল ছেলেটাকে; ও নাকি বড় হয়ে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন হতে চায়! এ আবার কেমন কথা? আমি তো জানতাম বড় হয়ে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে হয়!

এরই মধ্যে মা পাড়ি দিলেন এক অন্য জগতে । সব কিছুই কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে গেল, পৃথিবীটাই কেমন যেন ফ্যাকাসে, বিস্বাদ আর পানসে হয়ে গেল । এইসবের মধ্যেও ধ্রুবর উপস্থিতি ছিল বিশেষ ভাবে ।

ক্লাস সেভেন থেকে আর স্কুলের বাসে যাতায়াত করা যায় না । অগত্যা পাবলিক বাস । কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ডানা গজালো আমাদের । স্কুল ফেরত পাবলিক বাসের বদলে যদি হেঁটে যাওয়া যায় খানিকটা পথ, বা পুরোটাই; তাহলে? তাহলে তো ক্লাসের আড্ডাটা আরও একটু বাড়ানো যায়, নয় কি? তেমনই হোল । স্কুল থেকে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ধরে হেঁটে, সুচিত্রা সেন-মুনমুন সেনদের বাড়ি পেড়িয়ে, বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ ছাড়িয়ে সোজা বালিগঞ্জ ফাঁড়ী । সেখান থেকে ধ্রুব বাসে যেত পার্ক সার্কাসের দিকে, আর আমি আর একটু হেঁটে উল্টোমুখে গড়িয়াহাট-গোলপার্কের দিকে! সাথে আরও কয়েকজন থাকত, সুমন্ত (চক্রবর্তী), চন্দ্র (চন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী), হোজো (জ্যোতির্ময় দত্ত), ইন্দ্র (ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি), কল্লোল (রায়) - এরা । মাঝে-সাঝে যোগ দিত প্রমিত (মুখার্জি), বা গৌরাঙ্গরা (চ্যাটার্জি) । মাঝপথে সপ্তপর্ণীতে সুমন্তর বাড়িতে আড্ডা হোতো অনেক সময় । এই সময়ই বাড়ল ধ্রুবর সাথে বন্ধুত্ব! এখন থেকে আর শুধু স্কুল, বা স্কুল ফেরত রাস্তায় নয়, একে অপরের বাড়িতেও যাতায়াত শুরু হোল; আড্ডাও বাড়ল! ধ্রুবর বাড়িতে গেলে কাকু-কাকিমা (ধ্রুবর বাবা-মা) খুশী হতেন, বিশেষত কাকিমা । মনে হোতো যে কিছুক্ষণের জন্য হলেও, উনি আমার মায়ের অভাবটা কোন না কোন ভাবে পুষিয়ে দিতে চান । একই সাথে জুটি বেঁধে আমি আর ধ্রুব জিতেছিলাম আমাদের স্কুলের বাৎসরিক ক্যারাম-চাম্পিয়াঙ্গিপ, আমাদের ক্লাস নাইনে; এমনকি স্কুলের ক্লাস টেন,ইলেভেন বা টুয়েলভের বড় বড় দাদাদেরও হারিয়ে দিয়ে!

মাধ্যমিক এল, গেল । তেমন কিছুই টের পেলাম না । শুনেছিলাম আমাদের স্কুলের ফেল করা ছেলেও নাকি মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন পায়, স্টার পায়; ঠিক তেমনটাই হোল, সেটাই দেখলাম । উচ্চমাধ্যমিক এল । সবার মধ্যেই আই.আই.টি আর জয়েন্ট-এন্ট্রান্স পরীক্ষার হিরিক পড়ে গেল; ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবার বাসনায় । ধ্রুবর মধ্যে এই ব্যাপারে তেমন কোনও হেলদোল দেখলাম না, ও বোধহয় বেশী ব্যস্ত ছিল ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের সাফল্য কামনায়!

ঐ সময় নাগাদ ধ্রুব মাঝেসাঝেই নর্থ-বেঙ্গলে ওর কাকাদের বাড়িতে বেড়াতে যেত স্কুলের ছুটিতে, ফিরে এসে আমাকে ওদিককার গল্প শোনাত; ওদিককার মানুষরা নাকি অন্য রকম, এদিককার থেকে ভালো । ওখানে নাকি অমুক বাড়ির অমুক কাকিমা তমুক বাড়ির তমুক মামিমার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে নির্বিকার ভাবে কুটনো কেটে বা বাটনা বেঁটে গল্পগুজব সেরে দিব্যি নিজের বাড়ি ফেরত আসেন! আমারও আর কোলকাতায় মন টিকছিল না । বাইরে কোথাও যাব সেটাই মনে মনে ঠিক করলাম । কিন্তু আমার মনে তখন নর্থ-বেঙ্গল নয়, শুধুই অ্যামেরিকা!

কিন্তু মুখ ফুটে বাড়ির কাউকে সে কথা বলার সাহস পেলাম না; ছোট মুখে বড় কথা, বামুন হয়ে চাঁদ ধরা – এইসব শোনার ভয়ে । বাড়িতে লুকিয়েই শুরু করলাম অ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লাই করা, আর SAT-TOEFL পরীক্ষার প্রস্তুতি । কিন্তু এইসব করতে টাকা লাগে যে! তা পাব কোথায়? কয়েকটা প্রাইভেট টিউটরিং শুরু করলাম । কিন্তু তা যথেষ্ট নয় । এত কথা পেটে চেপেও রাখতে পারছিলাম না । বলেই ফেললাম দুই-একজনকে । ধ্রুব তাদেরই একজন । শুনে ও অবাক হোল না খুশী হোল তা ঠিক বুঝলাম না । ও শুধু জিজ্ঞেস করলো যে কত টাকা

লাগবে আমার, ঐ পরীক্ষা দুটোয় বসতে?

দিন কয়েক বাদে দেখি ও সকাল সকাল এসে হাজির আমার কাছে । এই সময় সাধারণত ও আসে না । বললাম কি রে, কি ব্যাপার, এই সাত-সকালে? দেখি ও ওর পকেট থেকে টাকা বার করছে । বলল যে "নে এই টাকা কটা রাখ, দেখছি আর কি করা যায় তোর ঐ SAT-TOEFL-এর জন্য"! এবারেও 'পরিত্রাতা ধ্রুব', শুধু 'দা'-টা বাদ দিয়ে ।

৩০০ টাকা! ঐ সময় আমার কাছে অনেক । হিসাব করে দেখলাম যে এতে আমার TOEFL-এর fee হয়ে যাবে । আর আমার টিউটরিং থেকে SAT-এর fee! কেল্লা ফতে! বন্ধুর বাড়ি পড়তে যাচ্ছি – এই মিথ্যা ফেঁদে বাড়ি থেকে পালিয়ে পরীক্ষা দুটো দিলাম, পাল্লা দিয়ে চালালাম অ্যাপ্লিকেশান করা । ক্রমে বাড়িতে জানাতে বাধ্য হলাম । অ্যামেরিকা থেকে এত চিঠি-পত্র আসতে লাগল বাড়িতে, যে না জানিয়ে আর উপায় ছিল না । তারপর একদিন এল সেই বহু আকাঙ্খিত চিঠিটা – অ্যাক্সেপটেন্স লেটার, উইথ স্কলারশিপ!

ধ্রুব এমনিই একদিন দেখা করতে এসেছিলো । ওকে জানালাম । শুনে আমাদের শোয়ার ঘরটার মধ্যেই ও বার কয়েক লাফাল, তারপর জড়িয়ে ধরে, চুমু খেয়ে, একেবারে একাকার কাণ্ড! আমার দেশ ছাড়ার দিনও ও এসেছিল, এয়ারপোর্ট পর্যন্ত । সেদিন আর কোন লম্ফ-ঝম্প ছিল না । বিদায় জানানোর সময় শুধু দেখলাম যে ওর চোখের কোণ থেকে ঝড়ে পড়ল কয়েক দানা মুক্ত । আমিও মুখ লুকিয়ে হাঁটা দিলাম এমিগ্রেসান অফিসের দিকে ।

এরপর অ্যাটল্যান্টিক আর প্যাসিফিক ছাড়াও আমাদের আলাদা করে দিলো প্রায় বারো ঘণ্টার 'টাইম-ডিফারেন্স' আমাদের দৈনন্দিন জীবনের রুটিন আর আমাদের সামগ্রিক জীবন ধারার তফাৎ, প্রায় বছর ২৫ যাবত । তারই মাঝে যতবার ভারতে এসেছি, ওর সান্নিধ্য পেয়েছি খুব কাছ থেকে; কোলকাতায়, মুর্শিদাবাদে, শিলিগুড়িতে । ও ঠিক মনে রাখে যে আমি কোন ধরনের গল্পের বই পড়তে বা গান শুনতে ভালোবাসি, তাই আগাম কিনে বা জোগাড় করে রাখে সেগুলো আমার জন্য! এগুলোর অনেক কিছুই অ্যামেরিকাতেও পাওয়া যায়, কিন্তু ওর কাছ থেকে পেতেই আমার বেশী ভালো লাগে; গল্পের স্বাদ বেড়ে যায়, গানগুলোও যেন আরও বেশী শ্রুতিমধুর লাগে! ওর ধারণা যে ওর দীর্ঘদিন যাবত অ্যামেরিকা-বাসী বন্ধু বোধহয় আর ভারতীয় বিধি-ব্যাবস্থায় ততটা সড়োগড়ো নয়, তাই দেখা করার সময়ও আগলে রাখে আমাকে (অনেকটা আমার দাদার মতো, দাদার কথা পরে লিখব) । আমাকে ওর কাছে যেতে হয় না, ওই আসে আমার সাথে দেখা করতে; যখন, যেখানে, যেমন ভাবে সম্ভব । একসাথে কোথাও যাওয়ার থাকলে ওই এসে আমাকে নিয়ে যায়; ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি বা ট্রেন-ভাড়া দিয়ে । এমনও হয়েছে যে আমি ওর বাড়ি থেকে সরাসরি গেছি আমার মুর্শিদাবাদের 'দেশের' বাড়ীতে, কিন্তু ট্রেনের টিকিটটা পয়সা খরচ করে কেটে আমাকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়েছে ওই, ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত আমার জানলার পাশে প্ল্যাটফর্মে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে!

এই সুত্রেই সম্প্রতি সম্ভব হোল ওর শালীর সাথে আমার বিয়ে; কারণ অ্যামেরিকা থেকে আমি যখন কোলকাতায় এসেছিলাম, তখন হঠাৎ কোরে ধ্রুব ওর কর্মস্থল শিলিগুড়িতে আমাকে ওর কাছে বেড়াতে না নিয়ে এলে হয়তো এমনটা হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না! এই প্রসঙ্গে একটা মজার ব্যাপার মনে পড়ে । আমরা যখন ক্লাস সেভেন বা এইটে পড়ি, ধ্রুব তখন একাই একদিন এক অদ্ভুত সমীক্ষা চালিয়েছিল, আমাদের কুড়ি মিনিটের টিফিন-ব্রেকটার মধ্যেই । সেইদিন ও আমাদের ঘনিষ্ট বন্ধু বান্ধবদের এক এক জনকে আলাদা ভাবে জিগ্যেস করেছিল যে সুযোগ হোলে আমরা অন্য কোন ক্লাসমেটের সাথে একসাথে থাকতে চাইব কিনা, রুমমেট বা একই পরিবারের সদস্য হিসাবে । যে কোন দুই বন্ধুর ইচ্ছা আর উত্তর মিলেমিশে এক হোয়ে যায় কিনা সেটা জেনে নেওয়াই ছিল ওর উদ্দেশ্য! এমনটা যে বাস্তবে সম্ভব, তা কিন্তু ভেবেছিল ঐ ছোট্ট ধ্রুবই! এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো যে সেদিন আমার সাথে যার উত্তর মিলে গিয়েছিলো, সে ধ্রুব নয়, তপদেব (চক্রবর্তী) ।

বন্ধুতো ও ছিলই, বরাবরই । ধ্রুব এখন আমার ভায়রাভাইও বটে । আমি ভাগ্যবান, এ ছাড়া আর কী বা বলতে পারি? আমরা একই পরিবারের সদস্য, সেটাই বা আর আশ্চর্য কি?

বিয়ে উপলক্ষে ধ্রুবকে বেশ কয়েকদিন একসাথে খুব কাছে পেলাম । ওর শালীর সাথে ওর বন্ধুর বিয়েতে ওর ছুটো-ছুটি, দৌড়-ঝাঁপের কোন অন্ত ছিল না । বিয়ে করতে কোলকাতা থেকে আমি যখন সপরিবারে শিলিগুড়ি এসে পৌঁছালাম, তখন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আমাদের নিতে এসেছিল ধ্রুব । বিয়ের লগ্নে ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতেও আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিলো ওই । ওর শোওয়ার ঘরে, ওর বিছানায় বাসর-রাত কাটালাম – বৌ সাথে থাকলেও মনের অনেকটা জায়গা জুরে ছিল শুধুই ধ্রুব । মনে হোল যে বিগত ২৫ বছর কখন যেন তলিয়ে গেছে ঐ অ্যাটল্যান্টিক বা প্যাসিফিকের কোন অতল গহ্বরে! ■

অসুরের অট্টহাসি

- শান্তনু চক্রবর্তী

মায়ের আসার সময় হলো, উৎসবের হাত ধরে
সিদ্ধিদাতা, বীণাপানি, কার্তিক সম্ভারে
তৎসহ লক্ষী দেবী, প্যাঁচা আছে সঙ্গে
রাজহংস, ময়ূর, ইঁদুর সবার আদর বঙ্গে

সিংহী মামা দাঁত খিচিয়ে, অসুর ভয়ভীত
এমন ছবি দেখে মোরা অভ্যস্ত নিয়মিত
ভয়ে ভয়ে অসুর আসে, মুচকি হেসে যায়
তাহার প্রতাপ আজও কায়েম, সেটা বুঝতে পায়

প্রতি বছর অসুর নিধন, হয়ে গেছে বাসি
মনমাঝারে সুপ্ত অসুর, জোরে অট্টহাসি
প্রায়শঃই জাগেন তিনি, ভাঙেন যে আড়মোড়া
অশান্তি'র বুনতে ফসল, তাহার ভারী ত্বরা

ধর্ম, জাতি, শিক্ষা, বর্ণ, কিছুই যে নাই বাদ
এসব অস্ত্র অমোঘ যেন, ছড়ায় অবসাদ
শুভ শক্তি'র প্রাণ হাঁসফাঁস, সঙ্গ ছাড়ে সবে
মায়ের শুভ আশীষ কী আজ তাহার সাথেই রবে?

অপেক্ষা তে থাকবো মা গো, সেই দিনটির তরে
যেদিন তুমি অসুর কে আর আনবে না মোর দ্বারে
মনের অসুর ক্ষুধায় মরুক, শুভ কে দাও শ্বাস
আগমনী আনুক হাসি, এটাই আমার আশ ।

বটবৃক্ষ

- সুব্রত বণিক

আমি এক প্রবৃদ্ধ বটবৃক্ষ,
আজি অতিক্রান্ত দুশো বছর,
ঘটনার ঘনঘটার সাক্ষী আমি,
মোর সুদীর্ঘ জীবন ভর ।
পড়ে নাতো মোর মনে,কেমনে
জন্মেছিলাম আমি,
জড়ায়ে বুকেতে রেখেছিল মোরে,
আহার দিয়েছিলে ভূমি ।
জন্ম নিয়েছিলেম ধরণীর এককোণে,
উঠেছি একাকী বেড়ে,
কত মানুষ যে আজি করে আনাগোনা
মোর চারিপাশ ঘিরে ।
কত বিহঙ্গ যে বেঁধেছে তারি নীড়
মোর এই অঙ্গ জুড়ে,
গোধূলিতে তারা সকলে আসি ফিরে,
প্রত্যুষে যায় যে উড়ে ।
প্রবল গ্রীষ্মে কতজনে নেয় আশ্রয়
মোর ছায়া সুনিবিড় তলে,
বারি বর্ষণেও দিই তাদেরে ঠাঁই
যাতে তারা না ভেজে জলে ।
কত অত্যাচারের সাক্ষী আমি,
কত স্বদেশীর তরে
করেছিল ইংরেজ, কত মানুষকে
অকারণে তারা মেরে ।
স্বাধীনতার পরেও আজও কমেনিতো
সেই ব্যথাতুর হানাহানি,
ক্ষমতার লাগি চলে আজও
সেই রেষারেষি খুনোখুনি ।
মোর জনম হ'তে কত সুখ-দুঃখের
ঘটনা দেখেছি আমি,
মনের আরশিতে ভেসে ওঠে 'নারীমুখ",
পেয়েছে, হারায়েছে তার স্বামী ।
কত খুনী আসি করেছে যে খুন মোর তলে
নিশুতি আঁধার রাতে,
তারাই যে আবার ঘোরে উন্নত শিরে,
যখন আঁধার কাটে প্রাতে ।
তস্করেরা সকলে করে যে বাটাবাটি
মোর আড়ালেতে আসি,
কেমনে যে তারা করেছে লুটপাট,
বলে ক'রে হাসাহাসি ।
যদিও মোর নেই তাতে সায়,
তবুও পারিনে করিতে যে প্রতিবাদ,
বিধাতা তো মোরে দেয়নি 'বুলি',
ভরে আছে মনে তাই অবসাদ ।
আমি করি তাদের প্রাণ ভরে ঘৃণা
যারা করে মোর অঙ্গহানি,
যদি মোরে দিত বিধাতা ক্ষমতা,
করতেম রোধ, এ হানাহানি ।

পাঁচালীর পথ

- শঙ্কর বসু

নরম হলুদ আলোয় মুখ ঢেকেছে বিস্তীর্ণ শহর
হেমন্তের মেঘমেলা আকাশে জন্ম নিচ্ছে
আসন্ন বরফের চাদর
স্বপ্নযাত্রীর চোখ খুঁজে ফেরে পাঁচালীর সেই পথ ।

অ্যাসফাল্ট আর উন্নয়নের আস্তরনে
ঢেকে গেছে পথের ঠিকানা
অসলোর প্রত্যন্ত গ্রামে মোমের আলোয়
হাওয়াই দ্বীপের এলোমেলো সন্ধ্যায়
আফ্রিকার বুকে সদ্য পাতা রেললাইনে
ব্রুকলিনের রাতে বা ভোরের আগ্রায়
টুকরো হয়ে পড়ে আছে পথ
ধুলোর রাশির মত ছিন্নভিন্ন ।

নিশ্চিন্তপুরের মাটী ছুঁয়ে হারিয়ে ছিল যে পথ
দিকশূন্য দিগন্তরেখা হলুদ মাঠের সীঁথি
শত বছরের আবর্তে পাক খেয়ে
পায়ে পায়ে মিশে গেছে পুরাতন খেয়াঘাটে
বিভূরায়ের বটতলায়
আরও কিছু কল্পনায় ।

"যে ফিরিবে বলিয়া যায়নি
শুধুই চলিয়া গিয়াছে
অচেনার মোহ মুগ্ধতায় ...
পাঁচালীর পথ তাহাকে খুঁজিয়া লইয়াছে
রাজপথের জনঅরণ্যে
ফিরাইয়া দিয়াছে অনির্বাণ কৌতূহলী চক্ষুদুটি
বাস্তবের কঠোর নির্মোকে নিবদ্ধ
কল্পনার কুঠুরিতে" ।

দুনিয়া

- কৌশিক ভট্টাচার্য্য

দুনিয়াটাকে নিজের মত করে পাল্টে দিতে চেয়েছিল সে ।
বড়-ছোটোর ব্যবধান ঘুচিয়ে
মানুষের জন্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলো
এক আদর্শ পৃথিবী ।

তারপর
অজস্র অত্যাচার
গুরুতর গঞ্জনা
আর
কান্নাভরা দীর্ঘশ্বাসের কোনো এক ফাঁকে
তার
অস্থিতে
মজ্জাতে
শিরাতে
শিরাতে
ঢুকে পড়লো
নিজেকে
ফুলিয়ে
ফাঁপিয়ে
ছোটো থেকে বড় করার নেশা ।

দুনিয়া তাকে পাল্টে দিলো নিজের মত করে ।